সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

সংগ্রন্থিত রচনা

গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা, স্মৃতিকথা ও চিঠি

https://www.facebook.com/nirjanprantar

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

অগ্রন্থিত রচনা

গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা, স্মৃতিকথা ও চিঠি

সম্পাদনা : সাজ্জাদ শরিফ

প্রথমা
প্রকাশন

অগ্রন্থিত রচনা
গ্রন্থস্বত্ব © ইরাজ ওয়ালীউল্লাহ ও সিমিন ওয়ালীউল্লাহ
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০১৩
মাঘ ১৪১৯, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ১৬০ টাকা

Agronthito Rochona
by Syed Waliullah
Translated from English by Shibabrata Barman
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info
Price : Taka 160 only

ISBN 978 984 90193 3 6

https://www.facebook.com/nirjanprantor

সূচিপত্র

ভূমিকা

অজানা ওয়ালীউল্লাহ ৭

গল্প

মুক্তি ২১

আমাদের প্রপিতামহ ৩৮

প্রবন্ধ-সমালোচনা-স্মৃতিকথা

প্রসঙ্গ : জয়নুল আবেদিন

১. স্ববিরোধী ধারণার বলি : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ৪৪

২. বিভ্রান্ত সমালোচনার বলি : এস আমজাদ আলী ৫৪

৩. অকুণ্ঠ সমালোচনার বলি : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ৬৬

আমাদের কয়েকজন শিল্পী ৭২

বাহারদা ৭৭

চিঠি

প্রিয় হৃষীকেশ বাবু ৮৮

অজানা ওয়ালীউল্লাহ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) প্রথম যে অনুভূতিটি আমাদের মধ্যে সঞ্চার করেন, সেটি বিস্ময়ের। ১৯৪০-এর দশকে সাহিত্যিক হিসেবে যখন তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে, কথাসাহিত্যে বাঙালি মুসলমান তখন মাত্র তার কৈশোরকালে পৌঁছেছে। সেই সাহিত্যপটে ওয়ালীউল্লাহর মতো লেখকের আবির্ভাবের সহজ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তিনি লিখেছেন সামান্যই। কিন্তু একটির পর একটি উপন্যাসে যে ক্ষিপ্রতা ও কুশলতায় তিনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গিয়েছেন, আমাদের অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলকে ছিঁড়েখুঁড়ে অভাবনীয় চেহারা দিয়েছেন এবং প্রতিটি রচনায় নতুনতর শিল্পরূপ গড়ে তোলার সৃষ্টিশীল সক্ষমতা দেখিয়েছেন; তার তুলনা শুধু বাঙালি মুসলমান-সমাজে নয়, সে সময়ের বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃততর পটভূমিতেও সহজে মেলে না। এই অনন্যতা তাঁর জন্য কালও হয়েছে। আমাদের বৃহত্তর সমাজ তো বটেই, আমাদের সাহিত্যজগৎও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর তাৎপর্য বুঝে ওঠার জন্য প্রস্তুত ছিল না ওয়ালীউল্লাহর প্রতি আমরা উৎসুক হয়ে উঠেছি অনেক বিলম্বে—তাঁর মৃত্যুর পরে, ধীরে ধীরে।

আর মাত্র ১০ বছর পর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। ১০ অক্টোবর ১৯৭১ সালে প্যারিসে তাঁর মৃত্যুর পরও ৪২ বছর পেরিয়ে গেছে। কিছু কিছু গবেষণা এই সময়ে তাঁকে নিয়ে হয়েছে। কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে বহু কাজ এখনো পর্যন্ত অসমাধেয়ই

রয়ে গেছে। ছকে বাঁধা চর্বিত পাঠে ওয়ালীউল্লাহর রচনা আজ অবধি দুঃখজনকভাবে বন্দী, ওয়ালীউল্লাহর জীবনের কিছু কিছু দিক আজও আমাদের কাছে গাঢ় ছায়ায় আচ্ছন্ন, এত দিন পরেও তাঁর বেশ কিছু লেখা অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত—অনেক লেখা হয়তো হারিয়ে যাওয়ারই পথে।

লালসালু (১৯৪৯) পাঠ এখনো আমাদের কাছে ধর্মব্যবসা ও কবরপূজার সীমা পেরিয়ে বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারেনি। আমরা ভেবে দেখিনি, উপন্যাসটির এই পাঠে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ইসলামের এক রক্ষণশীল ব্যাখ্যাদাতায় পর্যবসিত হয়েছেন। এই পাঠে তাঁর অবস্থান গোঁড়াপন্থী শরিয়া-অনুসারীদের দলে। অথচ ক্ষমতার উৎস ও তার পরাক্রম এবং উন্মূল ক্ষমতা ও ক্ষমতাসীনের জটিল সম্পর্কের বিচারের দিক থেকে *লালসালু* আরেকটি পাঠের প্রবল সম্ভাবনা থেকে গেছে। যে মাজার গ্রামবাসীর ওপর মজিদের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করেছে, আর কেউ না জানলেও মজিদ নিজে জানে, সে-মাজারের পুরো কাহিনিটাই মিথ্যা। মজিদের সঙ্গে মাজারের এই জটিল সম্পর্কের বিচিত্র জটাজাল এ উপন্যাসের নানা জায়গায় চমকপ্রদভাবে ছড়িয়ে আছে।

অস্তিত্ববাদের ছকের বাইরে আরও সৃষ্টিশীল পাঠের জন্য *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) উপন্যাসটিও পর্যালোচকদের অপেক্ষায় রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এর সম্ভাব্য একটি ভাষ্য সম্পর্কে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *কদর্য এশীয়র* ভূমিকায় আমরা বলেছিলাম, 'ভারতের বিশাল ভূখণ্ড দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে বিচ্ছিন্ন দুই অংশ নিয়ে গড়ে ওঠা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগোলিক কাঠামোটি ছিল পৃথিবীতে নজিরবিহীন। কালক্রমে মূল ভূখণ্ড হিসেবে পোক্ত হয়ে ওঠা পশ্চিম পাকিস্তান তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানকে একাধারে প্রান্তিক ও নিজের

ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। কার্যত ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যে আদান-প্রদানের সমস্ত যোগ। পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন যখন বেগবান হয়ে ক্রমাগত জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, *কাঁদো নদী কাঁদো* প্রকাশ সেই সময়ে, ১৯৬৮ সালে। সেই উত্তাল প্রেক্ষাপটে এ উপন্যাসে একটিমাত্র স্টিমার দিয়ে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে বাঁধা—যে সংযোগও কিনা একেবারে ছিন্নপ্রায়—কুমুরডাঙ্গা দ্বীপটির সঙ্গে পূর্ব বাংলার আশ্চর্য মিল কীভাবে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল, সে এক বিস্ময়ের ব্যাপার।'

বহু দিন হয় সমালোচনা-ব্যবসায়ীরা বাজারে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একজন অস্তিত্ববাদী লেখক। সত্যি বলতে কি, এই অতিচিহ্নিত বিশেষণের তলায় ওয়ালীউল্লাহর প্রায় পূর্ণাঙ্গ সমাধি ঘটেছে। মানুষ ও লেখক ওয়ালীউল্লাহর সত্তায় যে আরও কোনো স্তরান্তর থাকতে পারে, সেটি ভেবে দেখার মতো অবকাশ আর আমাদের হয়নি। এই উপমহাদেশের তুমুল উত্থানপতনময় ইতিহাসপটে তাঁরও যে একটি রাজনৈতিক সত্তা ছিল এবং সেটির ক্রমাগত বিবর্তন ঘটেছে, সে কারণে স্পষ্ট কোনো রূপ নিয়ে আমাদের কাছে তা ধরাও পড়েনি।

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আইএ এবং ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে বিএ করার মাঝখানে অল্প কিছু দিনের জন্য, ১৯৪১ সালে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ভর্তি হয়েছিলেন কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে, অর্থনীতিতে অনার্স পড়তে। সেখানে তাঁর বন্ধু হৃষীকেশ লাহিড়ীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, আরও বহু বাঙালি তরুণের মতো প্রথম যৌবনে ওয়ালীউল্লাহর মনও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। আবার ১৯৪০-এর দশকের সূচনাকালের এই মন দশকটির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত একই ছকে অবিচ্ছিন্নভাবে গড়িয়ে যায়নি। উপমহাদেশের রাজনীতির নানা ঘোরপ্যাঁচের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাগ

হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে যে রূপ নিচ্ছিল, তাতে তাঁর মন অশান্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি ঝুঁকে পড়েছিলেন অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের আন্দোলনের দিকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের বছর, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ তারিখে, হৃষীকেশ লাহিড়ীকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'পাকিস্তান ও ভারত উভয়েই আজ করুণভাবে খাটো হয়ে আছে। এই স্থায়ী বিচ্ছেদের ভবিষ্যৎ দুঃখজনক, কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবন রক্ষার জন্য এই অস্ত্রোপচার অনিবার্য ছিল। যদি আমরা শুধু এই অস্ত্রোপচারের জরুরি দরকারটাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারতাম।' এ চিঠিতে ওয়ালীউল্লাহর মন দ্বিধাগ্রস্ত ও বেদনার্ত।

১৯৬০-এর দশকে দুনিয়াজুড়ে উপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলোতে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক সংগঠনগুলো এসব আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা নেয়। ঠান্ডাযুদ্ধের সেই উত্তেজনাভরা সময়ে ত্রস্ত যুক্তরাষ্ট্র সেই আন্দোলনগুলোর বিরুদ্ধে তার বিপুল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসব ঘটনায় ওয়ালীউল্লাহর মতো সংবেদনশীল মানুষের মন সাড়া না দেওয়ার উপায় ছিল না। ওয়ালীউল্লাহ তাঁর মৌলিক ইংরেজি উপন্যাস *দ্য আগলি এশিয়ান*-এর শেষে যুক্ত প্রবন্ধটিতে মার্ক্সবাদের প্রতি অনুরাগ গোপন করার কোনো চেষ্টাই করেননি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রাম যখন চলছে, প্রবাস থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সে লড়াইয়ে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু সে বছরই, মাত্র ৪৯ বছর বয়সে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মারা যান। তাঁর অনতিদীর্ঘ জীবনের রাজনৈতিক মনোরেখা এখনো আমাদের অনায়ত্ত রয়ে গেছে।

লেখালেখির ক্ষেত্রে প্রায় প্রথম জীবন থেকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দ্বিভাষিক ছিলেন। মননধর্মী লেখা তিনি লিখতেন মূলতই ইংরেজিতে, সৃষ্টিশীল রচনা প্রধানত বাংলায়; যদিও মৌলিকভাবেই তিনি তাঁর দু-

চারটি গল্প ইংরেজিতে লিখেছিলেন। বস্তুত, প্রথম উপন্যাস *লালসালু*র ব্যাপক সাফল্যের পরও, তাঁর দ্বিতীয় বাংলা উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) প্রকাশের অন্ততপক্ষে ১০ বছর আগে, ওয়ালীউল্লাহ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন ইংরেজিতে। এর কারণ ছিল। তিনি সম্ভবত তাঁর কূটনীতিকের পেশাজীবন থেকে বেরিয়ে আসার একটি পথ খুঁজছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সম্ভাব্য অবলম্বন ছিল ইংরেজি ভাষায় লেখকজীবন বরণ করে নেওয়া।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রেস অ্যাটাশের দায়িত্ব চুকিয়ে ১৮ অক্টোবর ১৯৫৪-তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ঢাকা আঞ্চলিক তথ্য দপ্তরের তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। এখানকার কর্মক্ষেত্র তাঁর পছন্দ হয়নি। ঢাকায় কবি-বন্ধু আবুল হোসেনের বাড়িতে প্রায়ই তিনি গল্প করতে যেতেন। আবুল হোসেন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'এই পোস্টিং ওঁর একেবারেই পছন্দ হয় নি। এই সময় ওয়ালীউল্লাহ যতোদিন ঢাকায় ছিলেন ওঁর মন তেমন ভালো ছিল না।' পেশা নিয়ে ওয়ালীউল্লাহর ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিল। ৫ নভেম্বর ১৯৫৪ তারিখে আন মারি তিবোকে লেখা এক চিঠিতে ওয়ালীউল্লাহ জানাচ্ছেন, 'নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব অনিশ্চয়তায় ভুগছি। ভবিষ্যতে কী করব জানি না; কেননা এখন যা করছি তা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্য কোনো সুযোগ এখন খোলা নেই।...এজন্যেই যে বইটি এখন লিখছি তার ওপর এত ভরসা। মনে হচ্ছে বাইরের কোনো প্রকাশক এটি গ্রহণ করলে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলব।' ঘটনা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রত্যাশামতো ঘটেনি। ভাগ্যিস হয়নি; তা হলে *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদে*র মতো উপন্যাস থেকে বাংলা সাহিত্য বঞ্চিত হতো। তবে এও সত্য, ইংরেজিতে অন্তত একটি উপন্যাস *দ্য আগলি এশিয়ান* ও একটি

উপন্যাসিকা *হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিন্‌স্‌* তিনি লিখেছিলেন—আবু শরিয়া ছদ্মনামে। তাঁর লেখকজীবনের এই সংকট-পর্যায়ের ঘটনাক্রম সম্পর্কে এখনো আমাদের বিশদ জানা নেই।

আমরা অন্যত্র আলোচনা করে দেখিয়েছি, অন্তত ১৯৫৯ সালের আগে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পক্ষে *দ্য আগলি এশিয়ান* রচনায় হাত দেওয়া সম্ভব নয় (দ্রষ্টব্য: 'ভূমিকা/সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: প্রচ্ছদের অন্তরালে', *কদর্য এশীয়*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬)। কারণ এ উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল জে লেডারার এবং ইউজিন বারডিকের লেখা তীব্র কমিউনিস্ট-বিরোধী উপন্যাস *দ্য আগলি অ্যামেরিকান*-এর আবেগভরা প্রতিক্রিয়ায়। *দ্য আগলি অ্যামেরিকান* বেরিয়েছিল ১৯৫৯ সালে। *দ্য আগলি এশিয়ান*-এর পটভূমি নগর—আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, তৃতীয় বিশ্বের একটি কাল্পনিক রাষ্ট্রের রাজধানী। এ উপন্যাসের কুশীলবেরা ক্ষমতার নিয়ন্তা। ১৯৫৪ সালে যে ইংরেজি উপন্যাসটি ওয়ালীউল্লাহ লিখছিলেন, তার বিষয় ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়া বাংলাদেশের গ্রাম। আন মারিকে ১৫ অক্টোবর ১৯৫৪-তে এক চিঠিতে এ উপন্যাস সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহ লিখেছেন, 'এটি আসলে এখানকার গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে লেখা উপন্যাস, তবে এর পরতে পরতে আছে আমার ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তা। এর আঙ্গিকটি মজাদারও হতে পারে।' ১৯৫৪ সালে, *দ্য আগলি এশিয়ান*-এর আগে, যে ইংরেজি উপন্যাসটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ লিখছিলেন, সেটি গেল কোথায়? এর উত্তর আমাদের জানা নেই।

২

গবেষকদের কেউ কেউ—বিশেষ করে আবদুল মান্নান সৈয়দ ও সৈয়দ আবুল মকসুদ—সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বেশ কিছু অগ্রন্থিত রচনা নানা

সময়ে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু সেসবের বাইরে আরও বহু লেখা উদ্ধারের অপেক্ষায় রয়ে গেছে। ওয়ালীউল্লাহর স্ত্রী আন মারি ওয়ালীউল্লাহর ইচ্ছা ছিল, বাংলা একাডেমী থেকে ওয়ালীউল্লাহ-রচনাবলির দুই খণ্ডের ধারাবাহিকতায় তাঁর ইংরেজি লেখাগুলো সংকলিত করে তৃতীয় একটি খণ্ড বেরোবে। সে খণ্ডের জন্য তিনি নিজে অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে কাজ করারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বাংলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক মনসুর মুসার সঙ্গে এ নিয়ে আন মারির কথাও হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মহাপরিচালক তাঁর লেখা উপর্যুপরি বেশ কয়েকটি চিঠির আর কোনো জবাব দেননি। বাংলা একাডেমী তাঁর সঙ্গে সদয় আচরণ করেছেন, সে কথা বলা যাবে না। যা হোক, সম্ভাব্য সেই ইংরেজি খণ্ডের জন্য ওয়ালীউল্লাহর অগ্রন্থিত লেখার একটি তালিকা আন মারি তৈরি করেছিলেন। সে তালিকায় ছিল শিল্পী জুবেইদা আগা ও সাদেকাইনের চিত্রকলা নিয়ে নিবন্ধ; পাকিস্তানের জনগণ, সংগীত ও নারীস্বাধীনতা নিয়ে আলাদা আলাদা প্রবন্ধ; 'এলিট অ্যান্ড ম্যাস কালচার', 'বুক ডেভেলপমেন্ট', 'আন্ডারডেভেলপমেন্ট' এবং 'মিডিয়া অ্যান্ড ভায়োলেন্স' ইত্যাদি শিরোনামে ইউনেসকোর জন্য লেখা সন্দর্ভ; স্ত্রীর কাছে লেখা অজস্র চিঠি। আর ছিল ফরাসি শিরোনামের একটি পাণ্ডুলিপি। এসব লেখার ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত।

আন মারির তৈরি করা এ তালিকার বাইরের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কয়েকটি বাংলা লেখা আমরা পেয়েছি বিচিত্র উপায়ে। তার মধ্যে আছে একটি প্রবন্ধ ও একটি অপূর্ণাঙ্গ গল্পের খসড়া। যে উপায়ে এ লেখাগুলো আমাদের হাতে এসেছে, তা থেকে সন্দেহ হয়, তাঁর আরও কিছু বাংলা রচনা নানা ফাঁকফোকরে রয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। ভয় হয়, সময় যত গড়িয়ে যাবে, সেসব

উদ্ধারের পথ ততই হয়তো ক্ষীণ হয়ে আসবে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কিছু কিছু লেখা উদ্ধারের ঘটনা রীতিমতো রোমাঞ্চকর। প্রয়াত লেখক সেলিনা বাহার জামানের কাছ থেকে ওয়ালীউল্লাহর লেখা একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ উদ্ধার করতে গিয়ে নাটকীয়ভাবে খুঁজে পাই ওয়ালীউল্লাহর অজানা গল্পটি। এর সামান্য ইতিহাস আছে। বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগী হবীবুল্লাহ্ বাহার মারা যাওয়ার পর ১৯৬৮ সালে তাঁর স্ত্রী আনোয়ারা বাহার চৌধুরী ও কথাশিল্পী শওকত ওসমান তাঁদের সম্পাদনায় একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। স্মারকগ্রন্থে লেখা দেওয়ার জন্য আনোয়ারা বাহার চৌধুরী অনুরোধ করেছিলেন প্যারিসপ্রবাসী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে। সে অনুরোধে সাড়া দিয়ে ওয়ালীউল্লাহ লিখতেও শুরু করেছিলেন। কিন্তু মাঝপথে তিনি লেখাটি স্থগিত করে দেন। কেন? সে কথা জানা যায় আনোয়ারা বাহার চৌধুরীকে ১৬ জানুয়ারি ১৯৭০-এ লেখা তাঁর এক চিঠিতে। ওয়ালীউল্লাহ তাতে লেখেন:

> ভাবী,
>
> আপনার পত্র যথাসময়েই হাতে এসে পৌঁছেছিলো। উত্তর দিতে দেরী হলো কারণ আশা করেছিলাম এক সাথেই বাহারদার ওপর একটা লেখা পাঠিয়ে দেবো। লেখা শুরু করেছিলাম, কিন্তু খানিকটা এগুবার পর বুঝলাম বইপত্র ছাড়া লেখা সম্ভব নয়। এখানে কিছুই নেই। দু-একটা ব্যক্তিগত স্মৃতির কথা লেখা যায়, তাও আমার বাল্যকালের স্মৃতির কথা। তা পাঠকের কাছে সমাদর পাবে বলে মনে হয় না। তার চেয়ে বড় কথা, তেমন লেখায় তাঁর প্রতি সুবিবেচনা দেখানো হবে না।
>
> তাঁর সম্পর্কে লিখতে হলে ভালো কিছুই লেখা দরকার। সেদিনের কথা মাত্র, তবু যে সময়ে তিনি সমাজ এবং সাহিত্য-

সেবার কাজ শুরু করেছিলেন তখন আমাদের সমস্যার রূপটা অন্যরকম ছিলো। সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বিচার না করলে তাঁর অবদান বা চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

বুঝতেই পারছেন লেখার বড়ই ইচ্ছা এবং ভালো কিছু লেখারই ইচ্ছা। কিন্তু এখানে বসে তা হবে না। যেমন-তেমন একটা লিখতে ইচ্ছা হলো না।

হয়তো আপনি নিরাশ হবেন, তবে এখন যে লিখতে পারছি না তাতে আমার দুঃখও কম নয়। আশা রইলো সুযোগ-সুবিধা হলে ভালো একটা কিছু লিখবো।

শ্রদ্ধাপ্রীতি রইলো।

ইতি
স্নেহের
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

এর বহুকাল পরে, ১৯৯৬ সালে, আন মারি ঢাকায় এলে সেলিনা বাহারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর মুখে পুরো ঘটনাটি তিনি শোনেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর চিঠিটিও দেখেন। আন মারি প্যারিস ফিরে যাওয়ার মাস ছয়েক পরেই তাঁর কাছ থেকে সেলিনা বাহারের কাছে একটি প্যাকেট এসে পৌঁছায়। ওতে ছিল হবীবুল্লাহ্ বাহারের ওপর ওয়ালীউল্লাহর লেখার পাণ্ডুলিপিটি। পাণ্ডুলিপির নানা জায়গায় মারাত্মক কাটাছেঁড়া ছিল। কিছু কিছু বাক্যও ছিল অস্পষ্ট। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, সেটি নেহাতই একটি খসড়া। সম্ভবত অসমাপ্তও। পৃষ্ঠার পারম্পর্যও ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছিল না। ভাবের ধারাবাহিকতা বিবেচনা করে পৃষ্ঠাক্রম মিলিয়ে লেখাটি আমরা প্রকাশ করি। লেখাটির কোনো শিরোনাম ছিল না। 'বাহারদা' শিরোনামটি আমাদেরই দেওয়া।

এই লেখার সঙ্গে আরও একটি চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটে। খসড়াটি পড়তে গিয়ে লক্ষ করি, ওই পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত আরও দুটো পৃষ্ঠা এসেছে। এই পৃষ্ঠাগুলো শুধু মূল পাণ্ডুলিপির চেয়ে আকারেই বড় নয়, এর বিষয়ও একেবারেই আলাদা। এটি একটি গল্পের খণ্ডাংশ। পাণ্ডুলিপি দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এও কোনো গল্পের প্রাথমিক খসড়ার নেহাত একটি টুকরো। প্রচুর কাটাকুটি। মার্জিনে অজস্র ছিন্ন পঙ্‌ক্তি। কোনটি যে কোথায় গিয়ে ঢুকবে, তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। কিছু কিছু অংশ তো উদ্ধারের অযোগ্য। গল্পটির শুরু ও শেষ বলতেও সেটিতে কিছু নেই। কিংবা গল্পটা আদৌ শেষ হয়েছিল কি না, তাও জানার কোনো উপায় আমাদের ছিল না। এ গল্পটিরও কোনো শিরোনাম দেওয়া ছিল না। আমরা এর শিরোনাম দিই 'প্রপিতামহ'। 'প্রপিতামহ' ও 'বাহারদা'র মতো মৌলিক রচনাগুলোর নাম আন মারির তালিকায় ছিল না। হতে পারে, ওয়ালীউল্লাহ-সমগ্রের তৃতীয় খণ্ডের জন্য ইংরেজি লেখা লেখাগুলো একত্র করছিলেন বলে বাংলা লেখাগুলোর নাম তখনো তিনি তালিকাবদ্ধ করেননি। ফলে ওয়ালীউল্লাহর আরও কোনো অপ্রকাশিত বাংলা রচনা অগোচরে থেকে গেছে কি না, আমাদের জানা নেই।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে নিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সমালোচনা ও তার প্রতিক্রিয়াগুলোও পাই দৈবক্রমে। পাকিস্তানের *ডন* পত্রিকায় জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম নিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একটি আলোচনা লিখেছিলেন, আমরা কমবেশি সে কথা জানতাম। আমাদের এও জানা ছিল যে, সে আলোচনা খুব প্রীতিকর ছিল না। জয়নুল আবেদিন সে সময়ে খ্যাতির চূড়ায়। তুলনায় ওয়ালীউল্লাহ তখনো তেমন খ্যাতিমান নন, বয়সও তাঁর কিছুটা কম। কিন্তু তিনি চিত্ররসজ্ঞ ছিলেন; বহু শিল্পসমালোচনায় তাঁর সে পরিচয় তত দিনে ছড়িয়ে

পড়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শিল্পকলার সাম্প্রতিক চর্চাগুলো সম্পর্কে যে তাঁর যথেষ্টই ধারণা ছিল, নানা সূত্র থেকে সে তথ্য পাওয়া যায়। তিনি নিজেও ছবি আঁকতেন। পরে নিজের একাধিক বইয়ের প্রচ্ছদও করেছেন। ফলে আমাদের একটি কৌতূহল ছিল, তাঁর সময়ের সেরা চিত্রকর সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহর মতো একজন সংবেদনশীল কথাশিল্পী ও শিল্পরসিকের সমালোচনার বিষয়বস্তু কী।

লেখক ও ওয়ালীউল্লাহ-অনুরাগী মাহমুদ শাহ কোরেশী এবং ওয়ালীউল্লাহ-গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদসহ বিভিন্ন জনের কাছে সময়ে সময়ে লেখাটির খোঁজ করেও জয়নুল আবেদিনকে নিয়ে তাঁর লেখাটির কোনো হদিস পাইনি। মাহমুদ শাহ কোরেশী জানিয়েছিলেন, লেখাটির একটি প্রতিলিপি তাঁর কাছে আছে। কিন্তু অজস্র কাগজপত্রের মধ্য থেকে সেটি উদ্ধার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৯৫৫ সালের ২৩ অক্টোবর *ডন*-এর রবিবাসরীয় সাময়িকীতে 'জয়নুল আবেদিন: আ ভিকটিম অব কনফ্লিকটিং আইডিয়াজ' শিরোনামে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর এ সমালোচনাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আলোড়ন তোলে। দ্রুতই এস আমজাদ আলী নামে একজন 'জয়নুল আবেদিন: আ ভিকটিম অব কনফিউজিং ক্রিটিসিজম' শিরোনামে সে লেখাটির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। দীর্ঘদিন আমাদের অজানা ছিল—কিন্তু পরে আমরা জানতে পেরেছি যে—'জয়নুল আবেদিন: আ ভিকটিম অব ফ্র্যাংক ক্রিটিসিজম' শিরোনামে ওয়ালীউল্লাহ সে প্রতিক্রিয়ার একটি জবাবও লিখেছিলেন; নিশ্চয়ই প্রকাশেরই উদ্দেশ্যে, কিন্তু অজ্ঞাত কোনো কারণে আর প্রকাশ করেননি। লেখাটি অপ্রকাশিতই থেকে যায়।

ঘটনাচক্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অপ্রকাশিত এই লেখাটিই তাঁর মামাতো বোন সুলতানা সারওয়াত আরা জামানের সূত্রে আমর প্রথমে

হাতে পেয়েছিলাম। লেখাটি পেয়ে আবার নতুন উদ্দীপনায় *ডন*-এ প্রকাশিত আগের দুটো লেখা খুঁজতে শুরু করি। এবং এবার সৌভাগ্যক্রমে মাহমুদ শাহ কোরেশী লেখাগুলো খুঁজে পান।

হৃষীকেশ লাহিড়ীকে লেখা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর চিঠিগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের সাবেক সহকর্মী ও সাংবাদিক শ্যামল দত্ত। এ চিঠিগুলোর সময়কাল ১৯৪২ থেকে ১৯৫১ সাল। এসব চিঠিতে এবং হৃষীকেশ লাহিড়ীর লেখা চিঠিগুলোর মুখবন্ধে ওয়ালীউল্লাহর একেবারে অজানা একটি মনের পরিচয় মেলে। *ভোরের কাগজ*-এ স্থানস্বল্পতার কারণে হৃষীকেশ লাহিড়ীর মুখবন্ধের বেশ কিছু অংশ ছেঁটে ফেলতে হয়েছিল। আজ আফসোস হচ্ছে, সেই মূল মুখবন্ধটি আর আমাদের কাছে নেই। চিঠিগুলো ছাপিয়েছিলাম এক পৃষ্ঠা জুড়ে। স্থানাভাবে দু-তিনটি চিঠি বাদও দিতে হয়েছিল। বাদ দিতে গিয়ে দু-চার লাইনের কেজো চিঠিগুলোই বেছে আলাদা করেছিলাম। তবে একটি চিঠি নিয়ে মনটা বেশ খুঁতখুঁত করছিল। তাতে কিছু তথ্য ছিল। সে চিঠিগুলোও আজ আর নেই। বেশির ভাগ চিঠি বাংলায় লেখা হলেও ১৬, ১৭, ১৯ ও ২০ সংখ্যক চিঠিগুলো মূলে ইংরেজিতে ছিল, গল্পকার মশিউল আলম সেগুলো ভাষান্তর করে দিয়েছিলেন। চিঠির অস্পষ্ট অংশগুলোতে '...' চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখানেও সেগুলো রইল।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বেশ কিছু রচনার সঙ্গে দৈবক্রমে সম্পাদক হিসেবে আমার যোগ ঘটে গিয়েছিল। সংযোগে, সহযোগিতায়, অনুবাদে, সম্পাদনায় বহু লোকের অযাচিত সহযোগিতা পেয়েছি। ওয়ালীউল্লাহর উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু লেখা—বিশেষ করে *দ্য আগলি এশিয়ান* ও *হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিন্‌স্*—আমরা পেয়েছিলাম সুলতানা সারওয়াত আরা জামানের কাছ থেকে।

কোনো কোনো লেখক ও গবেষকের লেখা থেকে আগে আমরা জানতে পেরেছিলাম, *হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিন্‌স্* নামে ওয়ালীউল্লাহ একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। পাণ্ডুলিপিটি হাতে আসার পর আমরা জানতে পারি, এটি উপন্যাস নয়, উপন্যাসিকা। এবং পাণ্ডুলিপিটি মার্জিত ও সুসমাপ্ত। 'আমাদের কয়েকজন শিল্পী' প্রবন্ধের মূল ইংরেজি পাঠ 'সাম ইস্ট পাকিস্তান পেইন্টার্স' আমাদের দিয়েছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। 'মুক্তি' নামে যে গল্পটি এখানে সংকলিত হয়েছে, সেটির মূল ইংরেজি 'এসকেপ'ও পেয়েছিলাম মান্নান সৈয়দের কাছ থেকে। আহমদ আলী সম্পাদিত এবং ১০ আগস্ট ১৯৫০-এ করাচির 'কিতাব পাবলিশার্স' প্রকাশিত *পাকিস্তান পিইএন মিসেলেনি* থেকে তিনি এটি সংগ্রহ করেছিলেন। অকালপ্রয়াত লেখক শহীদুল জহিরকে অনুরোধ করামাত্র গল্পটি অনুবাদ করে দেন। সম্ভবত এটি তাঁর গল্প অনুবাদের একমাত্র নমুনা। বিভিন্ন সময়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেখাগুলো যাঁরা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং সেসব লেখা প্রকাশে যাঁরা আমাদের নানা পর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে আজ কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ বইয়ে সংকলিত গল্প, প্রবন্ধ, শিল্পসমালোচনা ও চিঠিপত্র থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পূর্ণতর হবে। এ সংকলনের কিছু কিছু লেখা ভবিষ্যতের ওয়ালীউল্লাহ-চর্চায় নিঃসন্দেহে নতুন আলো ফেলবে।

সাজ্জাদ শরিফ
ধানমন্ডি, ৮ জানুয়ারি ২০১৩

গল্প

মুক্তি

এটা ছিল বিশৃঙ্খল সিদ্ধান্তহীনতার একটি সময়: এই সময়ের ভেতর জেগে ছিল জং ধরা মিটারগেজ রেললাইনের—যে রেললাইন পেছনের দিকে ক্রমাগত প্রসারিত এবং সরু হয়ে আসছিল—উপর দিয়ে মন্থর গতিতে এগোনো ট্রেনের অবিশ্বাস্য রকমের বাস্তব এবং নিশ্চিত ঘরঘর শব্দ। মেঘহীন আকাশে প্রবল তেজে জ্বলছিল সূর্য। দিগন্তবিস্তৃত শূন্যতা এবং উত্তাপের নিচে এই ক্লান্তিকর যাত্রা মনে হচ্ছিল যেন অন্তহীন। জনাকীর্ণ কামরায় মানুষের গায়ের গন্ধ প্রবলভাবে ঝুলে ছিল : প্রসাধনকক্ষের দরজার কাছে ভনভন করছিল একটি ছোট্ট ও অকিঞ্চিতকর মাছি : এর দরজার নিচের প্রান্ত বরাবর একটি সরু ধারায় গড়িয়ে যাচ্ছিল নোংরা পানি।

যুবকটি অস্থির বোধ করে শূন্যতার বোধ তাকে বিরক্ত করে তোলে; ট্রেনের দুলুনিতে, যা মনে হয় অসংজ্ঞায়িত এবং উদ্দেশ্যহীন, তাঁর মন নিঃসঙ্গ হতাশায় ভরে যায়। মনে হয় কোনো কিছুতে তাঁর শ্বাসরোধ হয়ে আসে; শূন্যতার বোধ তাকে আবৃত করে ফেলে এবং সে হাঁপায়। শিগগিরই সে নিজেকে প্রবল ঝাঁকানি

দেয় এবং যখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়, সে শোনে তাঁর চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ এবং বেদনাকর সময়ের ঢেউ অদ্ভুত শব্দ করে বাজে। সে শোনে এবং দেখে এই সময়েরা কেমন করে বিদীর্ণ এবং বিগলিত হয়ে অস্তিত্বহীনতার ভেতর মিশে যায় এবং সে পরিষ্কারভাবে সেই বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে যে চঞ্চুসদৃশ নাক এবং সাদা সুচিকর্ম করা কিন্তু কিছুটা ময়লা সুতি কাপড়ের টুপি পরে তার উল্টো দিকে বসে ছিল। বুড়ো লোকটি নিথর হয়ে বসে ছিল এবং তাঁর নাকটি যদিও মাঝেমধ্যেই দেখা যাচ্ছিল, তাঁর অস্পষ্ট ধূসর চোখ দুটো মনে হচ্ছিল যেন দুটো অমসৃণ চামড়ার থলের ভেতর বসানো বড় ডিম্বাকৃতির মার্বেল। হয়তো দেখতে সে হাস্যকর ছিল অথবা হয়তো সে দর্শনকারীর মনে অদ্ভুত পুরোনো কোনো আগ্রহের সঞ্চার করত, যে কারণেই হোক, যুবকটি তাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে। প্রথমে তার মনে হয় যে, লোকটি পার্কে স্থাপিত একটি মূর্তি যার পাদদেশে উৎকীর্ণ রয়েছে একটি উচ্চ প্রশংসাসমৃদ্ধ লিপি, যা কেউ পড়ে না। সে এ রকম শত শত মানুষ দেখেছে, দেখছে তাদের সাদা নোংরা কাঁধ। সে কল্পনা করে যে, এখন পাখিরা চক্কর খেয়ে নেমে আসবে এবং তাঁর কাঁধের ওপর বসে তারা কিচিরমিচির করবে এবং তারপর লেজ উঁচু করে তার জীর্ণ কোটের ওপর বিষ্ঠা ত্যাগ করবে। সে কেঁপে ওঠে।

কিন্তু এই নিষ্কম্প অবয়ব ঘেঁষে প্রায় অদৃশ্য হয়ে বসে ছিল গম্ভীর এবং নিষ্পাপ চেহারার একটি বাচ্চা মেয়ে। যুবকটি তার দিকে তাকায় এবং তার বড় বড় উজ্জ্বল চোখের সাদা আভা ও তার নির্মলতা দেখে। অপাপবিদ্ধতার সুগন্ধ ছিল। তখন একদম হঠাৎ সে প্রবলভাবে হেসে ওঠে। তার এই হাসি ছিল বিস্তৃত এবং তার চোখ ছিল মধ্যদিনের সূর্যের দহনের নিচের প্রভাময় পানির মতো

চকচকে। সে তখন কিছুটা অনুমান করার চেষ্টা করে। এই মেয়েটি কি এই অসম্ভব রকমের ধীরগতির ট্রেনের যাত্রী, সকল উদ্বাস্তুর মতো বিপর্যস্ত এবং চূড়ান্ত রকমের অসহায় বোধ করছিল, নাকি করছিল না? হয়তো মেয়েটি তার মাকে হারিয়েছে; হয়তো হারিয়েছে পিতা এবং ভাই ও বোনদের; হারিয়েছে সকল সম্পত্তিও। কিন্তু দৃশ্যত এর দরুন মেয়েটি বিচলিত নয়। যুবকটি যখন এসব ভাবে, তার চোখ কুঞ্চিত এবং মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তারপর পুনরায় সে প্রবলভাবে হেসে ওঠে। সে যখন হাসে, তার গলা সিক্ত হয়ে আসে।

'তুমি কি গল্প শুনতে চাও?'

মেয়েটি মনে হয় যেন একটু চমকে যায়; সে যুবকটির দিকে তার ম্রিয়মাণ চোখ তুলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে এবং তারপর মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন যুবকটির চোখে হতাশা মূর্ত হয় এবং একটি আনন্দময় বাক্যালাপের সম্ভাবনায় টান হয়ে ওঠা তার দেহ শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে। কিন্তু তাহলেও সে ছিল একজন সাহসী মানুষ এবং ক্রমাগত চেষ্টা করে যাওয়ায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। সে আরও ছিল বল, প্রবল কষ্ট এবং বিপর্যয় সহ্য করতে পারার উপযুক্ত। অন্য উদ্বাস্তুরা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। তার শুধু অন্যদের ভয় লাগছিল; তাদের এই ভেঙে পড়া তার ভালো লাগছিল না। এই নির্দিষ্ট মুহূর্তে সে মেয়েটির বিষয়ে নিশ্চিতরূপে ভয় পায়। সে সুগন্ধি অপাপবিদ্ধতার ঘ্রাণ নেয় এবং নিজের অন্তস্তলে কেঁপে ওঠে। তবে শিগগিরই সে যথেষ্ট সাহস সঞ্চার করে আমুদে ভাবটি ফিরিয়ে আনে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তুমি গল্প শুনতে চাও,' সে বলে। 'আমিও গল্প বলতে চাই, কারণ', সে থেমে বলে, 'আমি একজন বিরাট গল্প

বলিয়ে। এখন তুমি একটুক্ষণের জন্য ধৈর্য ধরো, আমি তোমাকে একটা চমৎকার রোমাঞ্চকর গল্প শোনাব।'

সে তার চিবুক চুলকায়, মাথার পেছন দিকটা চুলকায়, মনে হয় যেন চোখ দুটো সরু করে এই প্রতিশ্রুত গল্প মনে করার প্রচেষ্টায় জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় এবং দূরে ঝাপসা এবং অস্পষ্ট দিগন্তরেখা সে যখন দেখে, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

নিস্তব্ধতা রাজত্ব করে।

তখন কী ঘটে? বিরাট বিস্তৃত কড়ইগাছে কাক চিৎকার করে এবং স্তব্ধতার শূন্য জমিনে গভীর রেখা টেনে দেয়। কেউ নড়ে না। নীরবতা ভয়াবহ হয়ে ওঠে, চুইয়ে পড়া রক্তের মতো ভয়াবহ। দুপুরের তীব্র রোদের নিচে রাস্তার পিচ গলে যায়; একটি অন্ধ গলির কোনার একটি নিচু ঘরের ছাদে লাগানো ঢালু ঢেউটিনের ভেতর থেকে নীরবে ক্রমাগত উজ্জ্বল বাষ্প বের হয়। একদম কোনো কিছু ঘটে না। কেবল রক্ত, নীরব ও ভয়ংকর, ক্রমাগত চুইয়ে পড়ে...

শিগগিরই যুবকটি হাঁপাতে শুরু করে; তার কপালে ঠান্ডা ঘাম জমা হয় এবং তখন মেয়েটি অর্তচিৎকার করে ওঠে। দ্রুত সে মেয়েটির দিকে তাকায় এবং তাকে পাগলের মতো বুড়ো লোকটার লম্বা কোটের প্রান্ত ধরে প্রবলভাবে টানতে দেখে যুবকটির চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, তবে তাঁকে এখন সজাগ দেখায়। তাঁরা চেহারায় অতঃপর রক্ত ফিরে আসে এবং সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ম্রিয়মাণভাবে হাসে। সে একদম হালকা অস্পষ্টভাবে তার নাকের ডগা চুলকায় এবং পুনরায় মেয়েটির দিকে তাকায়। তার নাকে একধরনের অনুভূতি হয়। অপাপবিদ্ধতার সুগন্ধ ছিল। কিন্তু সে কী করবে সে বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

এদিকে ট্রেনের কামরায় খুব ধীরে কথা বলার শব্দ জেগে ওঠে।

প্রশস্ত মুখের মাঝবয়সী মোটা যে মহিলা কোনার কাছে বেঞ্চের ওপর তার খর্বাকৃতির পা তুলে বসে ছিল, সে তখন তার নাক ঝাড়তে শুরু করে। যখন সে কথা বলতে থাকা প্রত্যেকটি মানুষের চেহারা লক্ষ করার চেষ্টা করে, তার চোখ এদিক-ওদিক ঘোরে এবং তার গম-রঙের পাণ্ডুর গালের ওপর দিয়ে অশ্রু নীরবে গড়িয়ে নামে। তার হাতের একটি আঙুল থেমে থেমে কাঁপে। তখন এই চওড়া মুখের নারী একটি তীক্ষ্ণ কিন্তু নিঃসহায় স্বরে বিলাপ করে। এই স্বরে একটা কিছু ছিল, যা যুবকটিকে চমকে দেয় এবং সে চোখে উদ্বিগ্ন একটি চাউনি নিয়ে সোজা হয়ে বসে। এটা ছিল পরিত্যক্ত হৃদয়ের দুর্বোধ্য বিলাপের মতো রহস্যজনকভাবে অসহায় ও অমানবিক কিন্তু একই সঙ্গে একটি তলোয়ারের মতো সবলে বিদীর্ণকারী।

'আরে না,' সে বলে এবং মাথা নাড়ে। তার উদ্বিগ্ন চোখের আলো গাঢ় হয়ে আসে এবং সে মেয়েটির দিকে তাকায় এবং তার ভয় সত্য হয়ে ওঠে। মাথা একটু বাঁকা করে মেয়েটা তীক্ষ্ণভাবে বিলাপকারী রমণীর দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটির মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর জন্য সে হঠাৎ হাততালি দেয় এবং পুনরায় প্রবলভাবে হেসে ওঠে।

'এই,' সে বলে।

মেয়েটি তার দিকে ঠান্ডা চোখে দেখে। তার ভ্রুর ওপর ঝুলে ছিল এক গোছা শুকনো ধুলোমলিন চুল। মেয়েটি তার ঝকঝকে মধুময় হাসিমাখা মুখের দিকে তাকায়; কিন্তু কোনো কথা বলে না।

'এই যে, তুমি,' সে অতি উৎফুল্ল কণ্ঠে আরেকবার বলে, 'কী নাম তোমার?'

মেয়েটি কথা বলে না, যদিও সে তার মুখের দিকে ক্রমাগত

তাকিয়ে থাকে। যখন মহিলাটির তীক্ষ্ণ বিলাপ অতি উচ্চগ্রামে পৌঁছায়, মেয়েটির চোখ মুহূর্তের জন্য কাঁপে। এই মহিলার বেদনার একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ শান্ত চোখের মণি ভেদ করে, তবে সে এ বিষয়ে সচেতন ছিল না। কিন্তু যুবকটির তখনো ভয় লাগে। সে হেসেই চলে এবং অনেকটা বোকার মতো। সে অপেক্ষা করে এবং তারপর বলে,

'ঠিক আছে, আমাকে তোমার নাম বলতে হবে না, শুধু আমাকে বলো—তুমি কি গল্প শুনতে পছন্দ করো? ধরো, পরিদের গল্প? তোমার যদি এই গল্পের দৈত্যদেরকে ভয় লাগে আমি এদেরকে গল্প থেকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিতে পারি অথবা তারা যাতে শান্ত সুবোধ ভদ্রলোকের মতো আচরণ করে, তার ব্যবস্থা করতে পারি। হয়তো বা তার পরও তাদের দেখতে দৈত্যের মতোই লাগবে, কারণ তারা যেহেতু এইভাবে তৈরি। এ বিষয়ে কিছু করার নাই, তবে ছোট বাচ্চাদের সামনে তারা যাতে ভালো আচরণ করে, তার ব্যবস্থা করা যায়। আমি এটা করতে পারব; কারণ', সে গর্বের স্বরে বলে, 'আমি একজন বিরাট গল্প বলিয়ে।'

তার পরও মেয়েটি কিছু বলে না। যুবকটি ক্রমাগত হাসে। কেবল সে যখন তার নিজের ব্যর্থতা অবলোকন করে, তার চোখ দুটো কিছুটা গম্ভীর লাগে। একটি বেদনাদায়ক বিরতির পর সে ইতস্তত করে বলে—

'হয়তো আদৌ কোনো দৈত্য থাকা উচিত না। আমি কি তাহলে গল্পটা সেইখান থেকে আরম্ভ করব, যেখানে কোনো দৈত্য নাই?'

মেয়েটি না বলে না এবং তাতে সে সাহস পায়। সাহস বোধ করায় সে অস্থির হয়ে পড়ে; তার মাংসপেশি শক্ত হয়ে ওঠে।

'আসলে, এটা একটা মজার গল্প; তবে এর কাহিনির সব কথা

আমাকে মনে করতে হবে। এক মুহূর্তের জন্য ধৈর্য ধরো।' তারপর অসচেতনভাবে মাথার পেছন দিক চুলকে—যে অভ্যাস তার স্কুলজীবন থেকে অব্যাহত আছে—সে বাইরের দিকে তাকায় এবং দেখে যে নিষ্প্রভ দিগন্ত স্বয়ং অতীতের মতো অস্পষ্ট এবং দূরবর্তী দেখায়। পুনরায় একবার সে নিজেকে হারায়।

নিস্তব্ধতা রাজত্ব করে।

সে মানসিকভাবে আঘাত পায় নাই। একটি ভাঙা শূন্য কলসি কোনায় পড়ে ছিল এবং মুখের স্বাদ কাঁচা ফলের রসের মতো লাগে। আর সবকিছু অক্ষত ছিল। সে চিৎকার শোনে নাই; নিস্তব্ধতা প্রবলভাবে রাজত্ব করে। রক্ত কেন কোনো শব্দ করে না? রক্ত নিঃশব্দে চুইয়ে পড়ে এবং সেই সময় তা একই রকম নীরবে চুইয়ে বের হচ্ছিল। সম্ভবত সত্যও কোনো শব্দ করে না। সব, যা-কিছু অসত্য, আওয়াজ তৈরি করে। একটি গভীর হয়ে আসা আয়তক্ষেত্রের মতো ছায়ার নিচে লোকটি মরে পড়ে ছিল এবং এটা ছিল সত্যি। সে কোনো শব্দ করে নাই। তার মুখটি তার ঈষৎ উঁচু হয়ে থাকা বাম কাঁধের দিকে ফেরানো ছিল এবং এটাকে চাল ধোয়া পানির মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। তার সামনে অমসৃণ দন্তরাজি হলুদাভ ওপরের ঠোঁটের তল দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। দাঁতগুলো চকচক করছিল কুকুরের দাঁতের মতো—যে কুকুরকে কারও শরীরে দাঁত বসানোর আগেই পরাস্ত এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এখানে সেখানে কুকুরেরা মারামারি করছিল। কুকুরদের পেট ফেড়ে উন্মুক্ত করা ছিল, জড়ানো নাড়িভুঁড়ি ছিল ধুলো এবং রক্ত মাখানো। এটা ছিল বিবমিষাকর। তার বমি করতে ইচ্ছা হয়। তখন, সে মুহূর্তে, সে ওপরের দিকে তাকায় এবং সেই বাড়িটার ওপরের আকাশ দেখতে পায়, যে বাড়ির ওপরের ব্যালকনিতে ফুলের নকশা

করা এবং জং ধরা লোহার রেলিংয়ে সমতল তলপেট ঠেকিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকত একটি মেয়ে। আজকে সেই মেয়েটি সেখানে ছিল না এবং মেয়েটির কথা সে স্মরণও করে না; সে কেবল আকাশ দেখে; নীল, গভীর এবং অতল আকাশ। সে বমি করে না।

ছোট মেয়েটি তাকিয়ে থাকে এবং তাকিয়ে থাকে এবং তারপর আর্তচিৎকার করে ওঠে। সে পাগলের মতো বুড়ো লোকটার কোটের প্রান্ত ধরে টানে এবং আর্তচিৎকার করে এবং ভীত স্বরে ফিসফিস করে,

'দেখো, লোকটা পাগল!'

যুবকটি তার দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, যা বিস্ময়কর লাগে পুনরায় তার কপালে ঠান্ডা ঘাম দেখা দেয় এবং তার চোয়াল ঝুলে পড়ে। তাকে ফ্যাকাশে, বিভ্রান্ত এবং ফাঁকা দেখায় সদ্য ঘুম থেকে জেগে ওঠা লোকের মতো। যে তার পারিপার্শিক অবস্থা তখনো বুঝতে সক্ষম নয়। শিগগিরই তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, যদিও তার লাল হয়ে ওঠার কী আছে তা সে বুঝতে পারে না। সে মেয়েটির দিকে অলক্ষিতে তাকায় এবং গভীরভাবে আরক্ত হয়। সে পাশ ফিরে বসে, চোয়াল চুলকানোর ভান করে এবং তারপর কাশে। সে তখনো আরক্ত হয়ে থাকে, লাল এবং উষ্ণ আরক্ততা।

হঠাৎ সে সোজা হয়ে বসে, তার আরক্ততা বেগুনি ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। তীব্র চোখে কোনার দিকে তাকিয়ে সে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলে, 'কাঁদো কেন, মা? আল্লাকে ডাকো, শুধু আল্লাকে ডাকো। তা ছাড়া আমরা তো বর্ডার পার হয়ে এসেছি, এখন তো আর ভয় নাই কোনো।'

সে যখন বিজয়ীর মতো মেয়েটির দিকে তাকায়, তার ক্রোধ দ্রুত অপসৃত হয়। তার চেহারা পুনরায় উজ্জ্বল আলোকময় হাসিতে

প্লাবিত হয়, যে হাসি পূর্ণ হয়ে থাকে মমতায়। সে তার হাসি মেয়েটির দিকে প্রসারিত করে দেয় এবং শব্দ করে গন্ধ নেয়। অপাপবিদ্ধতার সুগন্ধি ছিল। মনে হয় সে এই গন্ধ পায়। এই গন্ধ ছিল মিষ্টি, এত মিষ্টি যে তা যুবকটির হৃদয় সাহসে পূর্ণ করে দেয়। অবশ্যই, সে সব সময়ই সাহসী ছিল। সে কখনোই ভেঙে পড়ে নাই, সময় যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন।

'আমি বাজি ধরতে পারি, তোমার খিদে পেয়েছে,' সে বলে, 'ঠিক আছে, ট্রেনটা এখন একটা স্টেশনে ঢুকছে। হয়তো এটা একটা বড় স্টেশন আর আমরা হয়তো এখানে খাওয়ার জন্য কিছু সময় পাব। তোমার জন্য আমি কিছু জোগাড় করব, কেবল আমাকে তোমার নাম বলতে হবে, এখানে মানুষেরা তাদেরকে নাম না বললে কিছু বিক্রি করে না। এটা একটা মজার দেশ। আমি তাদেরকে আমার নাম বলব কিন্তু তারা তোমার নামও জানতে চাইবে।' সে থামে এবং কায়দা করে জিজ্ঞেস করে, 'আমি তখন তাদেরকে কী বলব?'

মেয়েটি কেবল বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকে, সে তার নাম বলে না। সে কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে, তারপর মেয়েটার দিকে দুষ্টুমিভরা চোখে তাকায় এবং ঘোষণা করার মতো করে বলে, 'হয়তো তোমার কোনো নাম নাই।'

মেয়েটি তার পরও তার নাম বলে না। হয়তো তার অহংকারের কোনো বোধই ছিল না, যা জাগিয়ে তোলা সম্ভব ছিল।

ট্রেনটা ধীর গতিতে দুলে দুলে স্টেশনে প্রবেশ করে। এটা ছিল একটা ছোট স্টেশন, তবে গাড়িতে চড়ার জন্য অনেক লোক প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। এখন তারা সকলে চিৎকার করে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করে। যুবকটি গাড়ি থেকে নামে।

লোকেরা হুড়োহুড়ি করে তাকে ধাক্কা দিয়ে এদিক-সেদিক নিয়ে যায়। কোনোক্রমে সে এই অবস্থা থেকে রেহাই পায় এবং ধুলোধূসরিত নিচু প্ল্যাটফর্মের এক কোনায় গিয়ে দাঁড়ায়। সূর্যের তেজ ঝরে পড়ে; মানুষের একটা ঝাঁজালো বিবমিষাকর গন্ধ চারপাশ পূর্ণ করে রেখেছিল। প্ল্যাটফর্মের একদম শেষ প্রান্তে একটি গাছের ছায়ার নিচে একটি ছোট্ট চত্বর, এর মাঝখানে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল দুজন পুলিশ। একজনের বাম কাঁধ থেকে ঝুলে ছিল একটি বন্দুক; অন্যজনের হাতে ছিল একটি মেহগনি রঙের খাটো লাঠি। বন্দুকধারী লোকটার ছিল সিন্ধুঘোটকের মতো ঝোলানো গোঁফ, এই গোঁফ তার ঠোঁট দুটো আংশিক ঢেকে রেখেছিল এবং তার চিবুকে একটা অনিশ্চিত ভাব যোগ করেছিল। তারা দুজন কিছু পাহারা দিচ্ছিল। এটা ছিল আংশিক ঢেকে রাখা একটি মানুষের মরদেহ, যে তার নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত পার হতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন এখানে পড়ে আছে, সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ মাথার খুলি নিয়ে, শক্ত হয়ে।

যুবকটি মৃতদেহটি দেখে এবং এক মুহূর্তের মধ্যে একটি পাথরের মূর্তির মতো জমে যায়। শিগগিরই, তাকে ঘটনাস্থলে নিশ্চলরূপে প্রোথিত করে দেওয়ার প্রণোদনার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী এক তাড়না তার সক্রিয়তা ফিরিয়ে আনে। সে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় এবং ট্রেনের দিকে প্রাণপণে দৌড় দেয়। ট্রেনে ফিরে সে অনেকক্ষণ বসে বসে হাঁপায়, তার ঠোঁট শুকিয়ে যায়, তার গলার গিঁট ওপর-নিচে ক্রমাগত নড়ে। দৃশ্যতই সে তার চারপাশ সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়ে, এমনকি খেয়াল করে না মেয়েটির উপস্থিতিও। যে এতক্ষণ পর্যন্ত যুবকটির প্রতি সম্পূর্ণ নীরবতা দেখালেও এখন তার দিকে চোরা চাউনিতে তাকায় এটা দেখার

জন্য যে, সে কথা রেখেছে কি না এবং তার জন্য খাবার এনেছে কি না। মেয়েটির ক্ষুধা লেগেছিল এবং তার কান্না পায়, তবে সে কাঁদে না।

ট্রেনটা চলতে থাকে। একটা ঘূর্ণি বাতাস বয়ে যায় এবং দূরের মাঠে ধুলো পাক খেয়ে এদিক-ওদিক ছোটে, নিষ্প্রভ দিগন্তরেখাকে মুছে দেয়। যাত্রীরা বসে বসে ঘামে এবং কাতর ধ্বনি করে; কেউ কেউ ঝিমায়।

সংকট কেটে যাওয়ার পর যুবকটি তার ব্যথা হয়ে যাওয়া পিঠ সোজা করে এবং চারদিকে আবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তার চোখ দুটো ভারী এবং কিছুটা বিহ্বল মনে হয়। মেয়েটি তখনো চোখের কোনা দিয়ে তাকে লক্ষ করে, কিন্তু যখন সে আবার এদিক-ওদিক দেখতে শুরু করে, মেয়েটি কিছুটা অস্পষ্টভাবে আরক্ত হয়ে দ্রুত তার চোখ অন্যদিক ফিরিয়ে নেয়। একটা তীব্র দমকা বাতাস মেয়েটির মুখে এসে লাগে। তার শুকনো চুলের গোছা এলোমেলোভাবে ওড়ে এবং তার রাঙা হয়ে ওঠা গালের ওপর এসে পড়ে। সে যখন মেয়েটির পেলব দেহ এবং অন্যদিকে ঘোরানো ভিজে আসার কারণে চকচকে চোখ দুটো দেখে, সে তার হৃদয়ে বিষাদ অনুভব করে, অনুভব করে বিষণ্নতার উষ্ণতা, স্নেহ এবং আঁকড়ে থাকা বাসনা।

সে হাসে এবং হাততালি দেয় এবং বলে, 'এই যে!'

মেয়েটি পুনরায় কিছু বলে না এবং সে তার ঘুরিয়ে রাখা মুখও এদিকে ফেরায় না। কিন্তু সে ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে, ইত্যবসরে তার মনে আরও বিষণ্নতা এসে জমে। অবশেষে সে বিষাদমাখা কণ্ঠে বলে, 'হয়তো তুমি আমাকে পছন্দ করছ না। হয়তো আমাকে দেখে তোমার কোনো দানবের কথা মনে পড়ছে, যে গোপনে

তোমার স্বপ্নের ভেতর চলে এসেছিল।' সে আকস্মিকভাবে থামে এবং কপালে আঙুল দিয়ে মৃদু টোকা দেয়। 'গল্পের কী হলো? আমি কি তা শেষ করি নাই?'

সে কোথায় ছিল?

'দেখো,' সে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বলে, 'একটি ছোট্ট ঘটনা আমাকে বিচলিত করে রেখেছে। ওই স্টেশনে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমার খুব প্রিয় এক পুরোনো বন্ধু, আমি দেখি যে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুজন মোটাসোটা হিংস্র চেহারার পুলিশ তাকে পাহারা দিচ্ছিল। তবে আমি তোমাকে বলছি, সে একজন নির্দোষ মানুষ। আমি এই কথা কদর্য পুলিশগুলোকে বলেছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে বিশ্বাস করে নাই।' সে থামে এবং অনেক আঘাত পেয়েছে, এমন শোনায়—এ রকম এক কণ্ঠে বলে, 'তুমি আমার দিকে দেখছ না!'

মেয়েটি তখন তার চোখের কোমল কোণ দিয়ে অল্পক্ষণের জন্য তার দিকে তাকায় এবং গভীরভাবে আরক্ত হয়। তথাপি এই সংক্ষিপ্ত চাউনি তাকে উৎসাহিত করে তোলে। তার চেহারায় আনন্দ বিম্বিত হয় এবং তাকে বেশ উত্তেজিত দেখায়। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, সে এমন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আনন্দ অনুভব করে যে, সে যখন কথা বলার চেষ্টা করে তার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে এবং তার চোখে পানি চকচক করে। অবশেষে তার গল্প বলার জন্য সে নিজের আবেগ সংযত করে।

'তাহলে কোথায় ছিলাম আমি?'

হ্যাঁ, কোথায় ছিল সে? সে তন্নতন্ন করে খোঁজে তার মস্তিষ্কের ভেতর, কিন্তু তার মস্তিষ্ককে মনে হয় ক্লান্ত এবং অবসন্ন। কী বলছিল সে?

নৈশব্দ নেমে আসে। নৈশব্দ একচ্ছত্র রাজত্ব করে। পৃথিবীকে সে বলতে চায়, সেই গল্পটা কী ছিল? সে ভাবে যে, সে চেয়েছিল কেবলমাত্র একটা উঁচু বেদির মতো জায়গা এবং সে যখন বলতে শুরু করবে হাজার হাজার লোক এই জায়গার চারদিকে ঘিরে আসবে একজন মানুষের কথা শোনার জন্য, যে ছিল না নবী মোহাম্মদ, অথবা একজন যিশুখ্রিষ্ট, অথবা একজন গৌতম বুদ্ধ, কোনো ভুডু জাদু পুরোহিত, অথবা এমনকি কোনো মানবত্রাতা। এক ভীতিকর দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে; সে দেখে, লাখ লাখ কালো মাথা ঘিরে আছে একটি করুণ দেহকে, যে দেহ নরকের যাত্রী, অগণিত প্রাক্তন বিপথগামী অসহায় মানবতার মাঝখানে দোল খায়। কিন্তু সেই কথা বলতে চেয়েছিল, তার গলা দিয়ে গমগমে রক্ত হিম করা একটি চিৎকার নির্গত হয়, যদিও আশ্চর্যজনকভাবে সে এখন তার বক্তব্যও মনে করতে পারে না। সে তার বক্তব্যের সন্ধানে বের হয় কিন্তু টুকিটাকি ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় সব জিনিস দেখতে পায়: একটি ভাঙা পা, একটি বিচূর্ণ মাথার খুলি, একটি নীরব হলদেটে মুখ যা আর ক্রোধ অথবা বিপর্যস্ততার কারণে ফেনায় ভরে যায় না। হয়তো বা উপড়ে ফেলা গাছের একটি ভাঙা ডাল, ফাটা খেলার বল অথবা বিরান বনভূমিতে উষ্ণতাপ্রত্যাশী কোনো প্রাণী। সেখানে ছিল রক্ত, এই রক্ত আদিম নৈশব্দের ভেতর ঝরে পড়ছিল, ঝরে পড়ছিল। যদি মেয়েটি লোহার রেলিংয়ের সঙ্গে কুমারী তলপেট ঠেসে ধরে ব্যালকনির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে এবং শুনে থাকে হারিয়ে যাওয়া বাছুরের ডাক; যদি সেখানে দূরবর্তী নক্ষত্রের তলে থেকে থাকে উষ্ণ ঘরোয়া পরিবেশের অস্পষ্ট সন্ধ্যালোক। কিন্তু সে মূর্ছা যায় না। কারণ, সে মূর্তিমান বাড়িঘরের বেরিয়ে থাকা কোনার ভেতর

দিয়ে আয়তাকার আকাশ দেখতে পায়, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল এবং চিরস্থায়ী। কে আবিষ্কার করেছিল যে, লাল হচ্ছে বেগুনির পরিপূরক? অবশ্য এটা কে ছিল তাতে বিশেষ কিছু আসে-যায় না, তবে এ বিষয়ে কারও হয়তো অলস ঔৎসুক্য হয়—যে ঔৎসুক্য হালকা তথাপি এতটা শক্তিশালী যে, এর পক্ষে ভাবালু কথাবার্তা, কিংবা প্রতিবেশীর বাড়িতে কোনো শিশুর জন্মগ্রহণের সাধারণ খবরের মতো একই রকম সহজভাবে জীবন ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু এই ঔৎসুক্য লালের দিকে নিয়ে যায় এবং লাল হচ্ছে ঘন এক তরলের রং, যা নীরবে নির্গত হয় এবং যার ফলে এক ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারত, যদি না একটি আয়তক্ষেত্রের আকারের বিশাল নীল আকাশ থাকত। লাল ফিত এখানে হঠাৎ করে থেমে যায়।

আর একবার, হ্যাঁ আর একবার একটি তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার যুবকটিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। এটা ছিল বিপর্যয়কর। তবু সে স্থির থাকে এবং মেয়েটিকে পাগলের মতো বুড়ো লোকটার কোটের প্রান্ত ধরে টানতে দেখে এবং বলতে শোনে, 'দেখো, সে পাগল!'

পাগল! কে পাগল? একদম এই কামরার ভেতর একজন পাগল লোক? সে সোজা হয়ে বসে এবং প্রবল বিস্ময়ের সঙ্গে চোখ মিটমিট করে। 'কি, একটা পাগল লোক এখানে?' যুবকটি বলে এবং যত্নের সঙ্গে তার নাক চুলকায় এবং পাগল লোকটির খোঁজে চারদিকে তাকায়। তখন সে মেয়েটিকে গম্ভীরভাবে বলে, 'দেখো, মেয়ে। সে যে-ই হোক না কেন, যতক্ষণ আমি এখানে আছি তোমার মাথার একটা চুলে হাত দেওয়ার সাহস তার হবে না। এই আমার পেশি দেখো?'

সে মেয়েটিকে তার হাতের পেশি দেখায় এবং চোখ পিটপিট

করে। যখন সে হালকা মেজাজে চোখ টেপে, তার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে, এর সঙ্গে আসে কোমল মমত্ব এবং করুণা, যখন সে মেয়েটিকে দেখে লজ্জিতভাবে বুড়ো লোকটার জীর্ণ কোটের নিচে মুখ লুকানোর চেষ্টা করতে। মমতার প্রবল ঢেউ উঠে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়; মেয়েটির পেলব শরীর থেকে যে নিষ্পাপ মাধুর্য প্রকাশিত হয় তা তাকে মাতাল করে দেয়। 'আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে এত নরম কোমলতা এবং এত বিশুদ্ধ আনন্দ,' সে প্রার্থনা করার মতো গম্ভীরভাবে বলে এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত হয়ে ওঠে। বৈরী বায়ু, বৃষ্টি এবং সূর্যের দহন থেকে এই নরম কোমল তাকে রক্ষা করার জন্য সে কী না করতে পারে?

কিছুক্ষণ পর সে নিচু স্বরে বলে, 'আমি সত্যি তোমার জন্য যদি কিছু করতে পারতাম অন্তত যদি তোমাকে একটা ছোট্ট সুন্দর গল্প শোনাতে পারতাম।' সে যখন লুকানোর চেষ্টা করে যে, সে খুব গরিব এবং মেয়েটিকে কোনো উপহার, একটি পুতুল, মিষ্টি অথবা একটি সুন্দর জামা দেওয়ার অবস্থা নাই, তখন তার খুব শোচনীয় লাগে। সে একটি গল্প ছাড়া মেয়েটিকে আর কিছুই দিতে পারে না, এমনকি যে গল্পেরও পুরোটা তার মনে নেই। 'আসলে, আমার দাদি আম্মার কাছ থেকে আমি একবার একটা গল্প শুনেছিলাম। তখন আমি বাচ্চা ছিলাম। এই এতটুকু উঁচু। তাই আমার সবকিছু ঠিক মনে নাই। তবে আমি তা মনে করার চেষ্টা করতে পারি।'

এই কথা বলে সে ঐকান্তিকতার সঙ্গে চিন্তা করে, কারণ অস্পষ্টভাবে তার মনে হয় যে আগেও বিভিন্ন সময় সে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও তাদের প্রকৃতি কী ছিল তা সে জানে না। জীবন এ রকমই, সে ভাবে এবং মনে মনে হাসে। যখন তুমি কোনো গল্প শুরু করো তোমাকে এর শেষটা জানতে হবে। সে আবার ভেতরে ভেতরে

হাসে, সকৌতুকে বাইরের দিকে তাকায়। বাতাস পড়ে এসেছিল, ট্রেন এবং দিগন্ত একটি সমান্তরাল রেখা ধরে চলছিল; ফলে, দূরে গ্রামগুলো ঘুরে ঘুরে পাক খায়; চাকায় নিচে রেললাইন কাতর শব্দ করে গোঙায়। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল একটি নিঃসঙ্গ গাছ।

তখন কী ঘটেছিল? দেয়ালঘেরা সুরক্ষিত বর্ণাঢ্য জীবন দীর্ঘায়িত করা যাচ্ছিল না; জীবনকে মনে হচ্ছিল প্রান্তে দাঁড়ানো, সেই মেয়ের মতো, যে তার মসৃণ তলপেট ব্যালকনির ফুলের নকশা করা জংধরা রেলিংয়ের সঙ্গে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকত। এর ভেতরে কোনো উল্লাস-আনন্দ ছিল না; কারণ, শঙ্খচিল অন্তর্হিত হয়েছিল; গাঢ় সবুজ ফেনায়িত পানিতে তার ক্ষিপ্র ডানার ছায়া ছিল না। এটাই কি শেষ ছিল, শেষ ছিল স্বপ্নপাখি শঙ্খচিলের, যে পান করত বিশুদ্ধ লবণাক্ত বাতাস এবং ওজোন? এটা কি একই সঙ্গে শেষ ছিল মাথার খুলি এবং গর্বিত লাঠির, যা উঁচু করে ধরা হয়েছিল কেবলমাত্র এর বীভৎস অবয়ব এবং কুৎসিত বাহাদুরি দেখানোর জন্য; হরিণশিকারির দাঁতের মাড়ি এবং কাচ ঢাকা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পেছনের লোকটির ধারালো দাঁত এবং পানির নিচে কাদায় ডুবে থাকা চেরাই করা কাঠের লম্বা টুকরা? এবং সবশেষে পিপুলগাছতলার ছোট্ট কবরটির যেখানে কেউ কখনো অশ্রু ফেলেনি কিংবা বাতি দেয়নি শুধু এই জন্য যে, এটা ছিল একটি শিশুর কবর?

এবার যুবকটি বলতে গেলে ঘৃণা এবং ক্রোধে লাফিয়ে ওঠে। এটা সত্যি অসহনীয় ছিল। পাগল লোকটির কোনো রকমের অধিকার ছিল না বাচ্চা মেয়েটিকে ভয় দেখানোর, যে পুনরায় আরেকবার ভয়ে আর্তচিৎকার করে ওঠে। রাগে অন্ধ হয়ে সে সোজা হয়ে ওঠে দাঁড়ায়। তাকে মেয়েটিকে বাঁচাতেই হবে, মেয়েটিকে তার রক্ষা করতেই হবে। তবে কোনো কিছু করার আগে

সে মেয়েটির কাছে ঘেঁষে আসে এবং তার কানে ফিসফিস করে আশ্বাসবাণী শোনায়, 'একদম চিন্তা কোরো না। আমি এই শয়তানটার ঘাড় ধরে, তারপর উপরওয়ালা আল্লাই জানে, এখন আমি তার কী দশা করব।'

তখন একটা চিতাবাঘের মতো লাফ দিয়ে সে সামনে এগিয়ে যায় এবং কামরার ভেতর লোকটাকে খুঁজতে থাকে। সে এখানে খোঁজে, ওখানে খোঁজে, কাঠের বেঞ্চের তলায় উঁকি দেয়, ঘাড় লম্বা করে সাজিয়ে রাখা সব ট্রাংকের পেছনে দেখে; তীব্র দৃষ্টিতে সব যাত্রীর মুখের দিকে তাকায় কিন্তু সে তাকে কোথাও পায় না। তখন তার মনে হয় যে লোকটা হয়তো বাইরে এবং তাই দরজা খুলে চলন্ত ট্রেনের বাইরে পা বাড়ায়।

অনুবাদ : **শহীদুল জহির**

আমাদের প্রপিতামহ

অংশই কেবল নজরে পড়ে। আমরা সে-ধারারই অংশ, সে-ধারাই আমরা। তার সদৃশ্য অংশ নজরে পড়ে। যারা বংশতালিকা বা ঐশ্বর্য সম্পত্তি নিয়ে গর্ব করে, তারা সে-ধারার বুকে সুশোভিত বজরায় বেড়িয়ে বেড়ায়, যে-বজরা থেকে মিষ্টি-মধুর সঙ্গীত ভেসে আসে, কখনো বা আসে উচ্চ হাসির রেশ। কিন্তু তারা জানে না ভালো বজরা প্রবল ধারার বুকে নিঃসহায়; সে-ধারা যদি ঈষৎভাবেও পেশী নেড়ে ওঠে বা উত্তোলন করে, তবে তাদের সে-সুন্দর বজরা নিমেষে কোথায় যে তলিয়ে যাবে তার কোন হদিশ পাওয়া যাবে না। তারা যদি বজরায় চড়ে এমন নিশ্চিতভাবে বেড়িয়ে বেড়ায় তার কারণ সে-ধারার ক্ষমাশীলতা বা ধৈর্যের অন্ত নেই। আত্মগর্ব দাম্ভিকতায় অন্ধ না হলে সে-কথা তাদের বুঝতে বেগ পেতে হতো না। তবে তারা সত্যি অন্ধ ও তাদের দুঃসাহসের কারণ এই দৃষ্টিহীনতা। আমার সন্দেহ থাকলো না যে, সে-প্রবল ধারার ধৈর্যের শেষ হতে দেরী নেই : সহসা বৃহৎ অজগরের মতো ফুশে ফুলে উঠবে তার বক্ষদেশে প্রচণ্ড ঢেউ তুলে। কাগজের ঠোঙার মতোই তাদের সে-রঙদার আমোদ-বজরা অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এ-কথা ভাববেন না প্রকাশক সাহেব যে আপনি একটি বিপ্লবীর কাহিনী পড়তে বসেছেন। তেমন ধারণা হয়ে থাকলে ভুলই করবেন। বিশাল নদীর মতো প্রশস্ত গভীর যে-ধারাটি কল্পনা করে

তার সঙ্গে সহসা একাত্মতা বোধ করেছিলাম এবং কিছু সময়ের জন্যে মনে কেমন বল পেয়েছিলাম, সে-ধারার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বোধ করতেও দেরী হয় নি। ধারাটি অদৃশ্যপ্রায়, মূক, শ্লথগতি, তাছাড়া তার দিকরেখার চরম উদ্দেশ্য যেন রহস্যময়। রহস্যময় না তো কী? আমাদের মতো লক্ষকোটি অজানা মানুষ প্রগাঢ় অন্ধকার থেকে কিছু সময়ের জন্য প্রকাশ পায়। তারপর আবার অদৃশ্য হয়ে যায় যে-অন্ধকার থেকে এসেছিলো সে-অন্ধকারে। সে-সময়েও তাদের নির্লিপ্ততা কিছুই দূর হয় না। এত গভীর সে-নির্লিপ্ততা যে তা দূর করতে পারে না—না অপমান—অত্যাচার না দুঃখকষ্ট। বংশতালিকা নিয়ে বা ঝলমল করতে থাকা টাকার থলে নিয়ে যারা তাদের বুকের ওপর দাঁড়িয়েই লম্ফঝম্ফ করে, তাদেরকে বাধা দেয় না, তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। তবে এটা কী শুধু নির্লিপ্ততা? সহসা আমার মনে হয়, তাদের বিচিত্র ব্যবহারের মধ্যে কোন গূঢ় অর্থ আছে, তাদের কোথাও একটি উদ্দেশ্য আছে, যা বুঝবার ক্ষমতা নেই কারো। সে-উদ্দেশ্য রহস্যময়। কিছুদিন তাদের সে-রহস্যময় দুর্বোধ্য উদ্দেশ্য আমার মনে ভয়ের সঞ্চারই করে। ঐ বিষয়ে আর ভাবি নি; ভাববার সাহস হয় নি। তবু যে-কটূক্তি আমার পিতার অন্তর ধারালো ছুরির মতো বিদ্ধ করেছিল, সে-কটূক্তিটি সহজে ভুলতে পারি নি। এ-সময়েই আমাদের পরিবারের একজন অজানা পূর্বপুরুষকে নিয়ে একটা নিতান্ত অলীক কাহিনী আবিষ্কার করি।

আমি বলেছিলাম, আমাদের অঞ্চলে একসময়ে নীলকরদের বড় দৌরাত্ম্য ছিল। সহসা একদিন আমি ঠিক করলাম, আমাদের প্রপিতামহ নীলকরদের অত্যাচারে সহ্যাতীত হয়ে উঠে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। যার কথা ঠিক করলাম, এ-আন্দোলনের সমগ্র পরিকল্পনা, পরিচালনা, নেতৃত্ব এ-

সব দায়িত্বের সমস্ত ভার তিনি একাই বহন করেছিলেন। কল্পনাপ্রসূত বিদ্রোহটি এভাবে শুরু হয়।

একদিন আমার এক সমবয়সী বন্ধুকে নিয়ে নীলকুঠির ভগ্নাবশেষের কাছাকাছি কোন গাছ থেকে পাখীর শাবক ধরার খেয়ালে গিয়েছিলাম। একসময়ে সহসা লতাপাতা-আগাছায় ঢাকা সে-নীলকুঠির দিকে দৃষ্টি পড়লে কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে-দিকে তাকিয়ে থাকি। তারপর হঠাৎ আমার বন্ধুকে বলি, জানো, আমার বড়দাদাই ঐ নীলকুঠিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

কথাটা বলার পর আমিই স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম। কোত্থেকে এসেছে এই ভিত্তিহীন ধারণা? কিন্তু ততক্ষণে কথাটা বলা হয়ে গিয়েছে, আর পেছনে ফেরা যায় না। পেছনে ফেরার ইচ্ছাও করি নি। বিচিত্র সে-ধারণাটি শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইয়ে দেয়। ক্ষুদ্র একটি বীজের মতো ধারণাটি মাথায় থাকে। তা ধীরে ধীরে বড় হয়, গুঁড়ি, শাখা প্রশাখা, পাতা পল্লব নিয়ে একটি মস্ত বৃক্ষে পরিণত হয়। অবশ্য বীজটি জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে এ-বিষয়ে সন্দেহ ছিলো না কিসে তা পরিণত হবে, অতএব গাছ না হয়ে অন্য কিছু হবার দিক্‌ভ্রম হবার সম্ভাবনা ছিলো না। পূর্ণতা লাভে যদি কিছু সময় লাগে তার কারণ নীলকরদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতাম না, কীভাবে বিদ্রোহ পরিচালনা করতে হয় সে-বিষয়েও জ্ঞানটা তেমন ছিলো না।

প্রথম দিনই স্থির করেছিলাম আমার সে-অজানা পূর্বপুরুষের নাম ছিলো তাহাজ্জদ হোসেন। ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলাম, সে-নামটি সত্য নয়, বিদ্রোহের নেতা হবার পর আত্মপরিচয় গোপন করার প্রয়োজন দেখলে সে-ছদ্মনামটি গ্রহণ করেন। আরো বিশেষ কী, আমার বড়দাদা কখনো তাহাজ্জদ নামাজ পড়তে ভুলতেন না বলে নামটি কেউ প্রস্তাব করে। ক্রমশ আমার কল্পনাপ্রসূত সে-বিদ্রোহের

কাহিনী যখন তার শীর্ষবিন্দুতে পৌছায় তখন তা বেশ নির্মম রূপই ধারণ করে; চূড়ান্ত মুহূর্তে ফাঁসি দেয়া ইংরেজ [...] নিচে দাউ দাউ করে আগুনে পুড়তে শুরু করে। ফাঁসিতে ঝুলতে থাকা প্রাণহীন দেহগুলো আগুনে ভস্মীভূত হবার কাহিনী বলতে গিয়ে আমার নিঃশ্বাস খাটো হয়ে উঠেছিলো, কী একটা অবোধ্য নিষ্ঠুর আবেগে চোখও জ্বলজ্বল করতে শুরু করেছিলো।

আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলো: 'ওদের তো ফাঁসি দেওয়া হয়েছিলো। আবার তাদের লাশ আগুনে পোড়বার কী দরকার ছিলো?'

আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। নীলকরদের শুধু ফাঁসি দিয়েই কেন গল্প শেষ করি নি তা নিজেই বুঝতে পারি নি। মনে ভয় হয়েছিলো কী যে ঘটনাটি খুব নাটকীয় না করলে কেউ বিশ্বাস করবে না, এ যেন যাকে গভীর তমসার মধ্যে উদ্ধার করেছি তার কীর্তিকলাপ এমন ভয়াবহরূপে বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম যাতে সে কোনমতেই সে-অন্ধকারে মাথায় ফিরে যেতে না পারে। বা হঠাৎ আমার কচি মনও কী একটা দুর্বোধ্য জিঘাংসায় মাত্রাতিরিক্ত হিংস্র হয়ে উঠেছিলো!

'বড়দাদা তাই ঠিক করেছিলেন। নীলকরদের সকল অমানবিক অত্যাচারের যথাযথ সাজা দিতে চেয়েছিলেন।'

তারপর দিনের পর দিন সে-বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখেছি: ঘুমিয়ে, জেগে। কতবার যে নীলকরেরা ফাঁসিতে চড়েছে, কতবার যে লেলিহান আগুনে তাদের প্রাণহীন দেহ পুড়েছে, তার ইয়াত্তা নেই। যতই সে-দৃশ্য দেখেছি, ততই তা বাস্তব রূপ ধারণ করেছে। বলা বাহুল্য, বিদ্রোহোন্মত্ত ক্ষিপ্ত মানুষের রণধ্বনি, অকস্মাৎ ফেটে পড়া তাদের অনির্বাপনীয় ক্রোধ-বিদ্বেষ, রক্তের বদলা নেবার জন্য

তৃষ্ণা—এ-সব স্তিমিত করে একটি মানুষের চেহারাই সব সময় ভেসে উঠেছিলো পরিষ্কারভাবে। লোকটি সেই, যার নাম দিয়েছিলাম তাহাজ্জদ হোসেন, এবং যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত করেছিলাম, যে নীলকরদের বিরুদ্ধে সে-বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলো। তার চেহারা দৈহিক গঠন কেমন ছিলো তা স্থির করতেও দেরী করি নি : যখনই তার কথা ভাবতাম তখন একই চেহারা ভেসে উঠতো চোখের সামনে। আমার উত্তেজিত উর্বর মস্তিষ্কে যে-মানুষটি জন্ম নিয়েছিলো, তার চেহারা এতদিন পরেও মনে পড়ে। তার চরিত্র অঙ্কনের ব্যাপারেই বোধ হয় আমার কল্পনা সমস্ত বাঁধ ছাড়িয়ে গিয়েছিলো যেন। একটি মানুষের মধ্যে সব প্রকারের গুণাগুণ এনে জমা করেছিলাম। তবু কিছু সময় কাটলে এবং আমার চোখে তিনি প্রশ্নাতীতভাবে একটি সত্য মানুষের রূপ ধারণ করলে তিনি নিজেই যেন কেটে-বেছে কিছু গুণাগুণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রথমে বীরের বেশে সাজিয়েছিলাম তাকে, যে-বীরের চরিত্রে নির্ভীকতা, সাহসিকতা, তেজস্বিতা, এমনকি ঔদ্ধত্যতারও অভাব ছিলো না। যাত্রার ছাঁচে ঢালা বীরের মতোই ছিলেন তিনি সে-সময়ে। পরে তিনি অপেক্ষাকৃত সাধারণ মানুষে পরিণত হন যার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিলো তার মানুষের জন্যে গভীর দরদ। নিতান্ত সাধারণ মানুষ, যদি দাও-লাঠী হাতে নিয়েছিলেন তার কারণ তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারেন নি। তাকে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা হাতে না নিয়ে উপায় ছিলো না। নিজের স্বার্থের জন্যে নয়, নাম যশ ধনের নেশায় নয়, অত্যাচারিত দরিদ্র মানুষের জন্যেই তাঁর শান্ত স্থির, হয়তো একঘেয়ে জীবন, অল্প সময়ের জন্যে ত্যাগ করেছিলেন।

গভীর উত্তেজনার মধ্য দিয়েই দিন কয়েক কাটাই। আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন না, আমার জন্যে আমরাই কল্পনাপ্রসূত যে-

বিদ্রোহকাহিনীর দাম কত কী ছিলো, কীভাবেই বা তা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। আজো আমি সে-বিষয়ে ভাবলে হাসি না, তা বাল্যবয়সের আজগুবী খেয়াল বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। আপনি বলবেন, ব্যাপারটার সারমর্ম এই যে আমি আপনার অজানা অগৌরবনীয় অতীতকে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছিলাম, যার পশ্চাতে আমাদের গ্রামের অবস্থাপন্ন উচ্চশ্রেণীগত লোকটির কটূক্তি ছাড়া আর কিছু নেই। কথাটি সত্য : তা নিয়ে তর্ক করবো না। তবে [...] সে-বলেই তাকে নাকচ করা যায় না। কল্পনাপ্রসূত সে-কাহিনীর লক্ষ্য আজো কিছু বুঝতে সক্ষম হই এবং সে-সবের মূল্য কম নয় নীলকরদের বিদ্রোহ বা কল্পিত আমার সে [...]টি আমার অপমানের জ্বালার উপশম করেছিলো। কিন্তু সে-ই থেকে শুরু করে কোথায় চলে গিয়েছিলাম দেখতে পারছেন না? কটূক্তিটিই নিঃসন্দেহে কল্পনার জ্বালানিকাষ্ঠে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু ওই লোকটি নয়, গ্রামেরও কেউ নয়, নীলকরদের কেন জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত [হতে] হয়েছিলো সে-আগুনে? আমার কল্পনায় আমারই পূর্বপুরুষ বিদ্রোহী নেতায় পরিণত হলেও তাকে অর্থসম্পদশালীতে পরিণত করি নি; সে আমার কল্পনায় অজানা সাধারণ চাষাভুষা মানুষই রয়ে গিয়েছিলো। শুধু তাই নয়, আমার কল্পনায় আমি দেখতে পাই, একজন মানুষ কীভাবে অত্যাচারিত মানুষের জন্যে মাথা তুলে দাঁড়ায় অন্যায়কারী-জুলুমকারীর শাস্তির জন্যে, যে কিছুই চায় না, না পুরস্কার—না মান-যশ, যার কর্মের পেছনে জনপ্রেম ছাড়া আর কিছু নেই। না। আমার পিতার অপমান যদি ঐ ব্যাপারটির গোড়া খুঁজে পাওয়া যায়, [...]। শুধু আমার পরিবারের কথা ভাবিনি, ভেবেছি আমাদের মতো আর সকলের কথা।

প্রসঙ্গ : জয়নুল আবেদিন ১

স্ববিরোধী ধারণার বলি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

করাচিতে চলমান প্রদর্শনীতে জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্মগুলোয় আলতো চোখ বোলালে সহসা মনে হয়, এ শিল্পী সাদা রঙেই আঁকুন আর কালোতেই আঁকুন—কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি মৌলিক। কেননা তার সর্বসাম্প্রতিক কাজগুলো আবারও রেখাচিত্রে করা।

ক্যানভাসে একটি তৈলচিত্র আঁকার চেয়ে একই আকৃতির একটি রেখাচিত্র আঁকতে অনেক কম সময় লাগে। কিন্তু রেখাচিত্রের একটি প্রবণতা হলো, এটি দ্রুত একটার পর একটা আসতে থাকে। এটি হয়তো আরও বেশি করে সত্য জয়নুল আবেদিনের ক্ষেত্রে, যার কল্পনাশক্তি ও শিল্পপ্রতিভা এ বিশেষ শিল্পমাধ্যমে নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার পথ খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হয়। এ জন্য তিনি তৈলচিত্র পরিহার করে চলেছেন। বিশেষ কোনো একক আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রাখতে চান না

তিনি। যখনই তিনি বিশাল আকৃতির কোনো চিত্র আঁকতে যান, বিস্তৃত জমিনে খুঁটিনাটি ডিটেইল আঁকার একঘেয়েমি থেকে তিনি নিস্তার খোঁজেন। বড় ক্যানভাসে তাঁকে কেমন অতৃপ্ত এবং হয়তো কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত মনে হয়। একটা একক ধারণার চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর কল্পনাশক্তি কেমন ঝুলে পড়ে। ফলে তাঁর রঙের ব্যবহার স্বতঃস্ফূর্ততা হারায় এবং শিল্পী হিসেবে সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্য বাধ্যবাধকতাহীনতা—সেটি খর্ব হয়।

এতে অবশ্য অসুবিধার কিছু নেই। সব্যসাচীদের প্রশংসাকীর্তন পরিহার করার কারণে আমরা আধুনিককালে বিশেষায়ণকে দুর্বলতার বদলে বরং শক্তিমত্তা হিসেবেই বরণ করে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সর্বত্র বিচরণের যুগ আসলেই শেষ হয়ে গেছে। এ জন্য ছবি অনুধাবনের খাতিরে এমন বিশেষ ক্ষেত্র, পথ বা শৈলীকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাই যৌক্তিক, যেখানে শিল্পী তার মুনশিয়ানা দেখাতে পারেন।

তাঁর প্রতিভার শিখর

সেই একই কারণে আমি বিশ্বাস করতে এবং অনুধাবন করতে শুরু করেছি যে, পেইন্টিংয়ের যে মাধ্যমে জয়নুল আবেদিনের কল্পনাশক্তি মুক্তভাবে ছোটার অবকাশ পায়, সেই মাধ্যমেই তাঁর প্রতিভা শিখর স্পর্শ করে। বিপরীতে এ কল্পনাশক্তি সবচেয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তিনি নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সবচেয়ে লঘু মাধ্যমের আশ্রয় গ্রহণ করলে। ১২ বছর আগে বাংলা যে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়েছিল, তার ভয়াবহতা বিবৃত করার ক্ষেত্রে তিনি অনুভূতির যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা প্রদর্শনে সক্ষম

হয়েছিলেন, এ রকম ক্ষিপ্র, তীব্র এবং নির্ভার মাধ্যম ছাড়া সেটি সম্ভব ছিল না। দুর্ভিক্ষ নিয়ে তাঁর যে রেখাচিত্রগুলো তাঁকে রাতারাতি খ্যাতি এনে দিয়েছিল, সেগুলো নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনার অন্ত রাখিনি। বছরের পর বছর আমরা সেসব রেখাচিত্রই প্রদর্শন করতে তাঁকে বাধ্য করেছি। এমনকি করাচিতে এখন যে প্রদর্শনী চলছে, সেখানেও সে সময়কার কয়েকটি চিত্র ঝোলানো হয়েছে।

দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্রগুলো আঁকার পরের কয়েকটি বছর তুলনামূলকভাবে ঊষর গেছে। তবে সম্প্রতি তিনি আমাদের আড়ালে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় গিয়ে দ্রুত বিপুলসংখ্যক জলরং স্কেচ শেষ করেছেন। সেখানে তিনি থেকেছেন সহজ-সরল, সৎ অথচ বর্ণিল পাহাড়ি মানুষদের সঙ্গে (নান্দনিক বিচারে পুরো পাকিস্তানে এরা একমাত্র বর্ণিল জনগোষ্ঠী)। পাহাড়ের উপহার উজাড় করে পেয়েছেন তিনি এবং বেশকিছু বিষাক্ত পোকামাকড়ের দংশন ভোগ করেছেন, যার ক্ষতচিহ্ন এখনো সগর্বে বয়ে বেড়াচ্ছেন।

পাবর্ত্য চট্টগ্রাম

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামে করা জলরং-রেখাচিত্রগুলো তাঁর সাম্প্রতিকতম কাজ এবং যেহেতু সেগুলো তাঁর সবচেয়ে পছন্দের পদ্ধতিতেই করা হয়েছে, এ কারণে এগুলোর প্রতি সবাই বিশেষ নজর দেবে। নিঃসন্দেহে এসব রেখাচিত্রের মাধ্যমে তিনি চিত্রকলায় দেশের এযাবৎকালের অজ্ঞাত একটি অঞ্চল বাস্তবার্থে উন্মোচন করেছেন। তবে এসব চিত্রকর্ম শৈল্পিক আগ্রহের চেয়ে বরং ভূতাত্ত্বিক কৌতূহলেরই জন্ম দেয়।

আমি যা বোঝাতে চাই, গগাঁর প্রসঙ্গ উল্লেখের মাধ্যমে সম্ভবত তা ব্যাখ্যা করা চলে। দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলোর অধিবাসীদের ছবি আঁকতে গগাঁ ফ্রান্স ছেড়ে গিয়ে ইউরোপের সামনে উপস্থাপন করেন এমন এক জনগোষ্ঠী, যা ইউরোপীয়দের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিমাদের চোখ এসব মানুষের মধ্যে খুঁজে পেল একধরনের আলস্যময় রোমান্টিকতার ছোঁয়া। বস্তুবাদী শিল্পোৎপাদনমুখী সমাজকাঠামোর প্রভাবে বিভ্রান্ত পশ্চিমা বিশ্ব তখন একপ্রকার নিষ্কৃতির জন্য তৃষিত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। তবে গগাঁ যেভাবে এসব দ্বীপবাসীকে উপস্থাপন করেন, তা ভিনদেশের প্রতি আগ্রহ পেরিয়ে একপ্রকার শৈল্পিক অনুভূতি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। গগাঁর প্রতিভা ব্যতিক্রমী বিষয়গুলোর প্রতি স্বভাবসুলভ কৌতূহল দেখায়নি। তিনি কেবলই এক ভ্রামকের মতো যা কিছু অদ্ভুত, তা শুষে নেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন না, যা কিছু দেখেছেন, তা-ই নস্যাৎ করতে ব্যতিব্যস্ত হননি। গর্বের আতিশয্যে তাঁর অভিজ্ঞতাকে সম্ভবত অতিরঞ্জিত করেননি তিনি। সমাজের পরিয়ে দেওয়া ঠুলি খুলে ফেলে এক মুক্ত শিল্পী হওয়ার উদ্দেশ্যেই সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছে, এই ঠুলি তাঁকে আত্মপ্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ দিচ্ছে না। নিজের শৈল্পিক প্রকাশের জন্য যে পরিবেশ তাঁর কাছে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয়েছে, সে পরিবেশে আত্মবিকাশের মাধ্যমে গগাঁ নিজের সৃজনশীল শিল্পীসত্তা টিকিয়ে রেখেছিলেন।

জয়নুল আবেদিনের পার্বত্য এলাকার রেখাচিত্রগুলো সবার মনে যে প্রশ্নের জন্ম দেয় তা হলো: তাঁর পার্বত্য চট্টগ্রাম যাওয়ার উদ্দেশ্য কী? তাঁর কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করতে পারে, এমন উচ্চমার্গীয় কোনো নতুন বিষয়বস্তুর প্রলোভন কি কাজ করেছে তাঁর মধ্যে? শিল্পসুষমার বদলে ভৌগোলিক আগ্রহই কি তাঁকে উদ্দীপ্ত

করেছে? নাকি সেখানকার উপাদানগুলোর মধ্যে তিনি নিজের আবেগ ও আদর্শের নৈকট্য অনুভব করেছেন?

একটি বিষয় সুস্পষ্ট মনে হয়—শিল্পী সেখানে এমন কোনো পরিবেশ অনুসন্ধান করতে যাননি, যা তাঁর শিল্পপ্রতিভা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুকূল হয়। সে ক্ষেত্রে এমনটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যে, ধর্মীয়, সামাজিক এবং নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের বাকি অংশের চেয়ে ভিন্ন একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য সম্প্রদায়কে উপস্থাপন করার বাসনাই তাঁকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়ে থাকবে। নিজের চিন্তাধারা প্রকাশের আরও লাগসই মাধ্যম নয়, স্পষ্টতই চিত্রকর্মের কোনো নতুন উপাদান সন্ধান করেছেন শিল্পী।

এই অনুধাবন, আমার আশঙ্কা, এসব রেখাচিত্রের বিরুদ্ধে অনেকের অন্ধ বিরাগ জন্ম দিতে পারে; যদিও অস্বীকার করার জো নেই, তাঁর সেরা রেখাচিত্রগুলোর অনেক গুণই এসবে বিদ্যমান। তাঁর রেখাচিত্রে পাহাড়ি মানুষজন বাঁশের মাচায় নির্মিত বাড়িঘরের পাশে বসে নিশ্চিন্তে বিড়ি ফোঁকে, বর্ণিল পোশাক পরিহিত মহিলারা কাপড় বোনে—এসব মানুষ, তাদের শৈলশ্রেণী, খরস্রোতা নদী আর নৌকা—নিঃসন্দেহে নিখুঁতভাবে আঁকা। এরা আমাদের কাছে এযাবৎকাল লুকায়িত একটি মোহনীয় জগৎ উন্মোচন করে। তবে এই উন্মোচনের দায়িত্বটুকু ক্যামেরা ও রঙিন ফিল্ম বহনকারী কোনো জাতিবিদের (এথনোলজিস্ট) হাতে সমর্পণ করা যেত কি না—এ প্রশ্ন কেউ তুলতেই পারে।

মূল কারণসমূহ

জয়নুল আবেদিন নিঃসন্দেহে একজন শক্তিমান শিল্পী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সাম্প্রতিক রেখাচিত্রসমূহ যে-কাউকে এ কথা

ভাবতে বাধ্য করে, শিল্পী হিসেবে কোন পথ বেছে নেওয়া তাঁর উচিত সে বিষয়ে তিনি নিজে বিভ্রান্ত কি না। অন্যত্র আমি যে কথা বলেছি, আমি মনে করি, বিগত বছরগুলোয় শিল্পীর ব্যর্থতা ও তাঁর অসম্পূর্ণতার জন্য অংশত আমাদেরই দায়ী করা উচিত। এ সময়কালে আমরা শৈল্পিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে এবং অভিজ্ঞতা কুড়াতে তাঁকে বাধ্য করেছি। তাঁর ওপর নিবদ্ধ আমাদের নজর তিনি অহর্নিশি অনুভব করেছেন। তাঁকে আরেকটু নিভৃতি দেওয়া উচিত ছিল। তাঁর কাজের জন্য এটি জরুরি। আমার মনে হয়েছে, তিনি এমন এক সার্কাসের বাঘ হয়ে পড়েছেন, গগনবিদারী দামামাধ্বনিতে যে বাঘ তার সব শক্তিসত্তা ও শৌর্য হারিয়ে ফেলেছে।

আমাদের এ শিল্পীর ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। প্রদীপের ঔজ্জ্বল্যে আলোকিত তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর আমাদের সার্বক্ষণিক চাহনিই শুধু তাঁর শিল্পকর্মকে হত্যা করেনি, ঐতিহ্যবাদিতার প্রবল চাপও সংকট তৈরি করেছে। ওই চাপ প্রকাশ পেয়েছে ঐতিহ্যবাদের প্রতি ঘোষিত জনসমর্থন ও প্রশংসাবর্ষণের মাধ্যমে। ঐতিহ্যবাদের এই প্রকাশ্য প্রশংসাকীর্তনের সঙ্গে বিরোধ বাধে নতুন নতুন পথে পা বাড়ানোর প্রতি প্রতিভাবান শিল্পীর আগ্রহের। কেননা নতুন ক্ষেত্রে পা রাখলেই এর প্রতি আমজনতার প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। নিজের অভিপ্রায়ের ব্যাপারে শিল্পী যতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন না কেন, এই সংঘাত তাঁকে এতটাই দুর্বল করে দেয় যে, শেষ পর্যন্ত শিল্পী বর্ণহীন ও দিশাহীনভাবে চক্কর খেতে থাকেন। অন্তরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন তিনি।

ঐতিহ্যবাদিতার আলোকদীপ্তিবিহীন পৌনঃপুনিকতা সমর্থনকারী এ জনমত শিল্পীর বিভ্রান্তিকে আরও সংকটময় করে তোলে। আমি আলোকদীপ্তিবিহীন কথাটা এ জন্য বললাম যে

শিল্পের প্রতি আমাদের মনোভাব বিশ্লেষণ করলেই তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়, শিল্পের কাছে আমরা কী চাই, তা আমরা নিজেরাই জানি না। আমরা শিল্পে ঐতিহ্যবাদকে সমর্থন করি। আমাদের দেশে এটির নতুন আমদানি ঘটেছে। অথচ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, এটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ একটি প্রকাশভঙ্গি চিত্রকলার একমাত্রিক, পরিপ্রেক্ষিতহীন প্রাচ্যরীতি পরিহার করার কারণে আমাদের শিল্পবোধে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, যা কিছু আকর্ষণীয়ভাবে অবিকল দেখায়, তা-ই ভালো শিল্প। এই বদ্ধমূল বিশ্বাসের চৌহদ্দির কারণেই ঐতিহ্যবাদী শৈলীর আমরা গুণকীর্তন করি। এ জন্য কোনো পাকিস্তানির ড্রয়িংরুমে রংচঙে, চমৎকার বাঁধাইয়ের ফ্রেমে লাল জ্যাকেট পরা শেয়াল শিকাররত ব্রিটনের ছবি টাঙানো থাকলেও আমরা বিস্মিত হই না।

সন্দেহ নেই, জয়নুল আবেদিনের এসব জলরং-রেখাচিত্র জনগণের কাছে গৃহীত হবে। কিন্তু এসব চিত্রের প্রতি আমাদের প্রশ্নহীন সম্মতির কারণে এগুলো শিল্পের প্রকৃত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে। শিল্পের দায়িত্ব হলো এমন এক প্রাণবন্ত ও নান্দনিক রীতি তৈরি করা, যা সাংস্কৃতিকভাবে অক্রিয় জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রণালিতে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে। আমরা আমদানি করা হাড়গোড়ে প্রাণসঞ্চার প্রত্যাশা করতে পারি না।

জয়নুল আবেদিনের সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আঁকা চিত্রকর্ম আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি যে, একদিকে জনমতের নির্দেশ আর অন্যদিকে নিজে প্রকৃতপক্ষে যা, তা-ই হয়ে ওঠার অভিলাষ—এ দুয়ের সংঘাতের নির্মম শিকার হয়েছেন তিনি। এ ব্যাপারে আমি আরও নিশ্চিত হয়েছি, কয়েক মাস আগে আঁকা তাঁর এমন ছবি দেখে, যেগুলোকে মোটের ওপর 'আন-একাডেমিক'

বলে আখ্যায়িত করা যায়। পশ্চাৎপটে আবছা রঙের গ্রাফের জমিনে এমন নিরীক্ষামূলক ভঙ্গিতে মানবশরীর আঁকা হয়েছে, যা অবশ্যই মৌলিকতার দাবি রাখে এবং এ রীতিটি অনুসরণীয়। এসব নতুন প্রচেষ্টার মধ্যে 'দ্য উয়োম্যান অ্যান্ড দ্য ক্যাট', 'দ্য স্নেকচারমার' উল্লেখযোগ্য। গত বছর ঢাকায় পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল আয়োজিত প্রদর্শনীতে এসব চিত্র প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল।

এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি তিনি কেবল স্থানীয়ভাবে তৈরি রং ব্যবহার করে বেতের মাদুরে ব্যতিক্রমী সব নকশা আঁকার পরিকল্পনা করেছিলেন (গণহারে তৈরির জন্য তিনি বেতের মাদুরের এ রকম একটি নকশা বেতের কারিগরদের দিয়েছেনও)। আমার মনে হয়েছে এ উদ্যোগ অত্যন্ত মৌলিক, যা একাডেমিক ঐতিহ্যবাদিতায় ছেদ ঘটানোর পাশাপাশি এমন একটা কিছুর মেলবন্ধন ঘটায়, যার সঙ্গে মাটির গভীর যোগসূত্র রয়েছে। অথচ 'দ্য উয়োম্যান অ্যান্ড দ্য ক্যাট' ছবিতে এবং বেতের মাদুরের নকশা তৈরির মাধ্যমে যে মৌলিক শৈলী উন্মোচিত হয়েছে, তা পূর্ণমাত্রায় উদ্ভাবনের জন্য নিজের সকল উদ্যম ও কল্পনাশক্তি নিয়োগ করার বদলে আমরা দেখি শিল্পী পার্বত্য চট্টগ্রামে ছুটে গিয়ে অজস্র জলরং-রেখাচিত্র এঁকে এনেছেন। আশ্চর্য নয় যে, এসব শিল্পকর্মের মূল্যসংক্রান্ত স্বাভাবিক প্রশ্নের বদলে এগুলো আঁকার পেছনে শিল্পীর অভিপ্রায় নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

আমাদের অতি অবশ্যই এ কথাটা বুঝতে হবে যে, অপরিবর্তনীয় ও অবিকৃতভাবে ঐতিহ্যের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি ঘটালেই শিল্প-সংস্কৃতি পুষ্পিত হয় না। বরং একটি গ্রাহ্য সংশ্লেষণী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গতিশীল ও প্রাগ্রসর কোনো কিছুতে ঐতিহ্যের রূপান্তরের মাধ্যমেই শিল্প সৃষ্টি হয়। ইউরোপ ভ্রমণের সময় জয়নুল

আবেদিন স্পেনের শহরের রাস্তাঘাট এবং ফরাসি বাগিচার জলরঙে ছবি এঁকেছিলেন। এ ধরনের নমুনা দিয়ে যত দিন পর্যন্ত আমাদের শিল্পীসমাজকে পরিতৃপ্ত রাখা হবে, তত দিন পর্যন্ত আমাদের শৈল্পিক সম্ভাবনাগুলো সুপ্তই থেকে যাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সু-অঙ্কিত রেখাচিত্রগুলোও আমাদের জনগণের কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করতে সক্ষম হবে না। এসব ছবির ব্যর্থতার কারণ, এগুলো একদিকে যেমন অতিব্যবহৃত, অতিচর্চিত শৈলীরই পুনরাবৃত্তি, অন্যদিকে দেশের আদিবাসী ঐতিহ্যের ভেতর এর কোনো শেকড় নেই। অন্য কথায়, এগুলো এমন কোনো শৈল্পিক আবেগ সঞ্চারে অপারগ, যে আবেগ জনগণের কল্পজগতে তোলপাড় তুলতে পারে।

আমাদের দেশে বিশ্লেষণী, প্রগতিশীল, সাংস্কৃতিক জনসমষ্টি নেই—এটি সত্যি বড় আফসোসের বিষয়। যদি থাকত, তাহলে জয়নুল আবেদিনের মতো গুটিকতক প্রতিভাধর শিল্পীর কাঁধে চেপে বসা ভার অনেকটা লাঘব হয়ে যেত। যেহেতু এ যুদ্ধে তাঁরা নিঃসঙ্গ যোদ্ধা এবং যেহেতু শিল্পের পথ বাছাই ও অনুসরণের দায়িত্বটুকু তাঁদের একাই পালন করতে হচ্ছে, সেহেতু আপাতত এ দায়ভারটুকু বয়ে বেড়াতে তাঁরা বাধ্য। হয়তো তাঁরা এমন এক জাহাজের কাপ্তান, যে জাহাজ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরে পড়েছে। কোনো দিক থেকে কোনো সাহায্য কিংবা সরঞ্জাম আসার সম্ভাবনা নেই। অথচ যেখান থেকে জাহাজ ছেড়েছে, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো তীরে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব তাঁদের কাঁধে।

তবে আমরা হয়তো যথার্থই প্রত্যাশা করতে পারি, জয়নুল আবেদিন শেষ পর্যন্ত বাস্তব প্রতিবন্ধকতাগুলো উতরে গিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন। তাঁর মধ্যে প্রতিভা আছে। নিজের জনগণ, তাদের দুঃখবেদনা, স্বপ্ন ও সাধের ব্যাপারে তাঁর

অন্তর্নিহিত জ্ঞান রয়েছে। তিনি তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। তিনি জানেন, কোথায় শূন্যতা দিগন্ত ছাড়িয়ে যায়, কোথায় অবয়ব, রং এবং জীবনযাত্রার প্রতি সংরাগের ঘাটতি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং নিজের কদর্যতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। এসব জানাশোনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার মতো অন্তর্দৃষ্টি তাঁর আছে।

অনুবাদ : **শিবব্রত বর্মন**

প্রসঙ্গ : জয়নুল আবেদিন ২

বিভ্রান্ত সমালোচনার বলি

এস আমজাদ আলী

ডন-এর ম্যাগাজিন বিভাগের পূর্ববর্তী একটি সংখ্যায় জয়নুল আবেদিনকে নিয়ে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। সমালোচক বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারেই নিয়েছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ কারণে আমরা, তাঁর পাঠকেরাও তাঁর কথাগুলো আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে আমাদের দোষ দেওয়া চলে না। এ জ্ঞানগর্ভ এবং ঈষৎ বিভ্রান্ত নিবন্ধটি ভালো করে পড়লে দেখা যায়, তিনি নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন :

১. জয়নুল আবেদিনের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত রেখাচিত্রগুলো কেবলই কিছু মামুলি রেখাচিত্র।
২. এ থেকে বোঝা যায়, রেখাচিত্র আঁকা ছাড়া তিনি আর কিছু করতে পারেন না।
৩. রেখাচিত্র আঁকার জন্য তাঁর পার্বত্য চট্টগ্রামে যাওয়া উচিত হয়নি। কেননা তিনি কেবলই 'এক নতুন বিষয়বস্তুর লোভে পড়েছিলেন'।
৪. 'একটি বিষয় সুস্পষ্ট মনে হয়, শিল্পী সেখানে এমন কোনো পরিবেশ অনুসন্ধান করতে যাননি, যা তাঁর শিল্পপ্রতিভা

প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুকূল হয়।'

৫. 'জয়নুল আবেদিন নিঃসন্দেহে একজন শক্তিমান শিল্পী। কিন্তু...' তিনি জানেন না কী আঁকতে হবে। সমালোচকের নিজের ভাষায়, 'কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সাম্প্রতিক রেখাচিত্রসমূহ যে-কাউকে এ কথা ভাবতে বাধ্য করে, শিল্পী হিসেবে কোন পথ বেছে নেওয়া তাঁর উচিত সে বিষয়ে তিনি নিজে বিভ্রান্ত কি না।'

৬. 'বিগত বছরগুলোয় শিল্পীর ব্যর্থতা ও তাঁর অসম্পূর্ণতার জন্য অংশত আমাদেরই দায়ী করা উচিত। এ সময়কালে আমরা শৈল্পিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে এবং অভিজ্ঞতা কুড়াতে তাঁকে বাধ্য করেছি।'

৭. না, একবাক্যে বলা যায়, এর বিপরীত কথাটাই বরং সত্য। তিনি লিখেছেন, 'ঐতিহ্যবাদিতার প্রবল চাপও সংকট তৈরি করেছে। ওই চাপ প্রকাশ পেয়েছে ঐতিহ্যবাদের প্রতি ঘোষিত জনসমর্থন ও প্রশংসাবর্ষণের মাধ্যমে। ঐতিহ্যবাদের এই প্রকাশ্য প্রশংসাকীর্তনের সঙ্গে বিরোধ বাধে নতুন নতুন পথে পা বাড়ানোর প্রতি প্রতিভাবান শিল্পীর আগ্রহের।'

৮. তাঁর পরবর্তী পর্যবেক্ষণ অনুধাবন করা আরও শক্ত। তিনি লিখেছেন, 'ঐতিহ্যবাদিতার আলোকদীপ্তিবিহীন পৌনঃপুনিকতা সমর্থনকারী এ জনমত শিল্পীর বিভ্রান্তিকে আরও সংকটময় করে তোলে।'

৯. শিল্প-ইতিহাসের এক চিমটি বয়ানে সমালোচক বলেছেন, 'আমরা শিল্পে ঐতিহ্যবাদিতাকে সমর্থন করি (?)। আমাদের দেশে এটির নতুন আমদানি ঘটেছে (!)। অথচ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এটি বহুব্যবহারে জীর্ণ একটি প্রকাশভঙ্গি।

চিত্রকলায় একমাত্রিক, পরিপ্রেক্ষিতহীন প্রাচ্যরীতি পরিহার করার কারণে আমাদের শিল্পবোধে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, যা কিছু আকর্ষণীয়ভাবে অবিকল দেখায়, তা-ই ভালো শিল্প।'

১০. এবার শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটুকরো নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন : 'শিল্পের দায়িত্ব হলো এমন এক প্রাণবন্ত ও নান্দনিক রীতি তৈরি করা, যা সাংস্কৃতিকভাবে অক্রিয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে। আমরা আমদানি করা হাড়গোড়ে প্রাণসঞ্চার প্রত্যাশা করতে পারি না।'

১১. 'একদিকে জনমতের নির্দেশ আর অন্যদিকে নিজে প্রকৃতপক্ষে যা, তা-ই হয়ে ওঠার অভিলাষ—এ দুয়ের সংঘাতের নির্মম শিকার হয়েছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে আমি আরও নিশ্চিত হয়েছি, কয়েক মাস আগে আঁকা তাঁর এমন ছবি দেখে, যেগুলোকে মোটের ওপর "আন-একাডেমিক" বলে আখ্যায়িত করা যায়।' (লক্ষ্য করুন, জয়নুলের কাজকে কেমন অনায়াসে ঐতিহ্যবাদী আর আন-একাডেমিক দু ভাগে ভাগ করে ফেলা হলো)।

১২. মাদুরের নকশার ক্ষেত্রে তিনি অনুমোদনের ভঙ্গিতে বলেছেন, এখানে এমন কিছু পাওয়া গেল 'যার সঙ্গে মাটির গভীর যোগসূত্র রয়েছে।'

১৩. তিনি পুরুতঠাকুরের কণ্ঠস্বরে বলেন : 'আমাদের অতি অবশ্যই এ কথাটা বুঝতে হবে যে, অপরিবর্তনীয় ও অবিকৃতভাবে ঐতিহ্যের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি ঘটালেই শিল্প-সংস্কৃতি পুষ্পিত হয় না। বরং একটি গ্রাহ্য সংশ্লেষণী (!) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গতিশীল ও প্রাগ্রসর কোনো কিছুতে ঐতিহ্যের রূপান্তরের

মাধ্যমেই শিল্প সৃষ্টি হয়।'

১৪. 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সু-অঙ্কিত রেখাচিত্রগুলোও আমাদের জনগণের কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করতে সক্ষম হবে না।' (বেচারা 'জনগণ'! তাদের সম্পর্কে আরেকটু আগেই বলা হলো, 'জয়নুল আবেদিনের জলরং-রেখাচিত্রগুলো নিঃসন্দেহে জনগণের দ্বারা সমাদৃত হবে।')

১৫. বর্তমানে জয়নুলকে পরিচালিত করছে জনরুচি। এখন তিনি 'এমন এক জাহাজের কাপ্তান, যে জাহাজ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরে পড়েছে। কোনো দিক থেকে কোনো সাহায্য কিংবা সরঞ্জাম আসার সম্ভাবনা নেই। অথচ যেখান থেকে জাহাজ ছেড়েছে, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো তীরে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব তাঁদের কাঁধে।'

রেখাচিত্র

বিজ্ঞ সমালোচকের উত্থাপিত কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। প্রথমেই বিবেচনা করা যাক, রেখাচিত্র বা স্কেচের প্রতি তাঁর তাচ্ছিল্যের প্রবণতা। তাঁর ধারণা, জয়নুলের চিত্রকর্মগুলো রেখাচিত্র হওয়ার কারণে এগুলো তৈলচিত্রের চেয়ে নিচু শ্রেণীর। এ ক্ষেত্রে এটুকু স্মরণ করলে ভালো হয়, জয়নুলের চেয়ে বিভিন্ন স্বভাবের এবং উচ্চমার্গের হলেও এ যুগে এমন বহু মহৎ চিত্রশিল্পী রয়েছেন, রেখা ও ওয়াশের মুক্ত ব্যবহারের কারণে যাঁদের চিত্র রেখাচিত্রের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। যেমন, মাতিস ও তাঁর শিষ্য দুফি। শুধু ল্যান্ডস্কেপ রেখাচিত্র নিয়েই দুফি প্রদর্শনী করছেন এবং সেগুলো ব্যাপক প্রশংসা কুড়াচ্ছে। এমনকি রঙের জাদুকর

ভ্যান গঘও এক হিসেবে বলা চলে পরিপূর্ণ তৈলচিত্র না এঁকে রেখাচিত্র এঁকেছেন। 'ভ্যান গঘের সমালোচনা করে বলা হয়ে থাকে, সারা জীবন তিনি এক খসড়া প্রস্তুতকারীই থেকে গেছেন—বলা হয়, অন্যেরা যেভাবে রেখাচিত্র আঁকে, তিনি সেভাবে ছবি এঁকেছেন; বলা হয়, তাঁর ছবির ধারণাগুলো সাদাকালো ধারণা। আমি মনে করি, এটিও শিল্প হয়ে উঠতে পেরেছে...। শিল্পীর নির্বাচিত মাধ্যম তাঁর প্রকাশভঙ্গিমার পরিধিতে কিছু ব্যত্যয় ঘটাতে পারলেও এর মাধ্যমে এটির কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটে না। বিপথগামী কোনো অ্যামেচার সুসজ্জিত স্টুডিওতে বসে সব ধরনের উপাদান দিয়ে যা করতে পারে, একজন প্রতিভাধর শিল্পী একটা ঝাড়ু হাতে নিয়েই তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করতে পারে।' (হার্বার্ট রিড)।

একইভাবে শিল্পবোদ্ধা ও সমালোচক পল স্যাচস রেমব্রান্ট সম্পর্কে লেখেন: 'তাঁর ল্যান্ডস্কেপ ড্রয়িংয়ে তিনি অজরুরি সকল বিষয় ছেঁটে দিয়ে চীনের সুং আমলের মহান শিল্পীদের কথা মনে করিয়ে দেন। গুটিকতক জাদুকরি স্ট্রোকের উদ্ভাস ও চমৎকার ভারসাম্যের মাধ্যমে তিনি এক প্রাণবন্ত অথচ শান্ত পরিবেশ এবং একটি দূরত্বের বোধ তৈরি করেন।'

এসব রেখাচিত্র থেকে আমরা যে গভীর আনন্দ লাভ করি এবং এগুলোকে উচ্চমার্গের বিবেচনা করি, এর মূল কারণ এগুলো আমাদের শিল্পীর অনুভূতির জগতের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে নিয়ে আসে এবং শিল্পীর আনকোরা, নিরাভরণ অভিজ্ঞতায় ভাগ বসানোর সুযোগ করে দেয়।

আর একটিমাত্র উদ্ধৃতি টেনে প্রসঙ্গটির ইতি টানব। 'ক্লদঁ লোরেঁ তাঁর একটি ওয়াশ ড্রয়িংয়ে, এমনকি তাঁর পেইন্টিংগুলোর

চেয়েও অনেক বেশি করে প্রকাশ করেন তাঁর শিল্পের সারসত্তা। গভীরতা ও দূরত্ব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ভেনিশিয়ানদেরও বহু আগে কলম ও ওয়াশের মাধ্যম এবং আলো ও ছায়ার বৈপরীত্যের ব্যবহার তিনি ও পর্সি রপ্ত করে ফেলেছিলেন।...আজ পেইন্টিংগুলোর চেয়েও অনেক বেশি করে তিনি পরিচিত তাঁর ল্যান্ডস্কেপ ড্রয়িংগুলোর জন্য।'

পরবর্তী আপত্তি

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে জয়নুলের রেখাচিত্রগুলোর ব্যাপারে সমালোচকের পরবর্তী প্রধান আপত্তি এগুলো 'শৈল্পিক আগ্রহের বদলে ভৌগোলিক কৌতূহল উদ্রেক করে' এবং 'ক্যামেরা ও রঙিন ফিল্মে সজ্জিত কোনো জাতিবিজ্ঞানী' এই কাজ আরও সুচারুরূপে করতে পারত (এ অপব্যবহারের ষোলোকলা পূর্ণ করতে এসব ছবি আঁকার দায়িত্ব ভূতত্ত্ববিদ, নাকি জাতিবিজ্ঞানী, না মামুলি আলোকচিত্রীকে অর্পণ করবেন, তিনি নিজেই নিশ্চিত নন)। শুধু বলা চলে, জয়নুলের এসব রেখাচিত্র যাঁদের কাছে শুধু বর্ণনাধর্মী ও টীকাটিপ্পনী মনে হয়, তাঁরা আসল মর্মবাণীটি অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাঁরা বাস্তববাদী নন। এসব রেখাচিত্রে আপনি যতটা না পার্বত্য চটগ্রামকে খুঁজে পাবেন, তার চেয়ে বেশি খুঁজে পাবেন জয়নুল আবেদিনকে—তাঁর রোমাঞ্চকর হৃদয়, তাঁর ঐকতানিক চিন্তাজগৎকে; অন্য কথায়, অনুভূতি ও ডিজাইন সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে। চট্টগ্রামে পাহাড়-বনানী শুধু পেরেক মাত্র, যার সাহায্যে তিনি ঝুলিয়ে দেন তাঁর বিমূর্ত ডিজাইন ও উচ্ছল অনুভূতি। কেউ যদি এসব উপেক্ষা করেন, তবে তিনি সাদা চোখে সবকিছু বিচারের

দায়ে দুষ্ট হবেন। সেই সঙ্গে তিনি সেইসব চটি-পরা দেহাতীদের পর্যায়ে নেমে যাবেন, যাঁরা ছবির মিউজিয়ামে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ অর্থ আবিষ্কারের ঘোষণা দিয়ে বলে ওঠেন, 'এইবার বুঝছি, এই যে, এইখানা একজন রাজা।'

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঁকতে যাবেন কেন জয়নুল আবেদিন? কেননা, এটি তাঁর কল্পনাশক্তিকে উসকে দেয়, তাঁর মধ্যে ভাবাবেগের দ্যোতনা সৃষ্টি করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঁকা যাবে না, এমন কোনো দিব্যি আছে নাকি? সমালোচক বলেছেন, গগ্যাঁ দক্ষিণ সাগর দ্বীপপুঞ্জ আঁকতে গিয়ে নতুন প্রতিবেশের প্রভাবে নতুন শৈলী তৈরি করেছিলেন। কাজেই জয়নুলও একই কাজ করেছেন, না হলে তিনি সেখানে যেতেন না। প্রথমত, জয়নুলের জন্য এখন পর্যন্ত কেউ সে রকম বৈপ্লবিক প্রতিভার মর্যাদা দাবি করেনি। দ্বিতীয়ত, কোনো বড় শিল্পী মোহনীয় দৃশ্য আঁকার মানসে দূরদেশে গিয়ে কোনো অভিনব শৈলী উদ্ভাবন না করেও ছবি আঁকতে পারেন। দেলাক্রোয়া উত্তর আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। ফিরে এসে আগের মতো করেই ছবি এঁকেছেন। তাঁর সংরক্ত ভঙ্গিমার সঙ্গে শুধু প্রাচ্যের বর্ণময় জগতেরই নৈকট্য লক্ষ করা গেছে। এই নৈকট্যই এগিয়ে নিয়ে গেছে। সে রকমই জয়নুলের মুক্ত কল্পজগৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতির বুনো সৌন্দর্য, রঙের বৈভব ও মৌলিক ফর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এ কথা বলা নিছক এক অনুমান ছাড়া কিছু নয় যে, 'একটা বিষয় সুস্পষ্ট। শিল্পী তাঁর শিল্পপ্রতিভার প্রকাশভঙ্গির অনুকূল কোনো পরিবেশের সন্ধানে সেখানে যাননি।'

আরবি নকশার আদলে রেখা ব্যবহার করে করা কাজগুলোকে সমালোচক 'আমদানি করা শিল্পভঙ্গি' এবং 'দ্য স্নেকচারমার' ছবির

মতো কিউবিক চিত্রগুলোর ক্ষেত্রে 'মাটির সঙ্গে গভীর যোগসূত্র' থাকা ছবি বলে উল্লেখ করেছেন। এর জবাবে শুধু এটুকু বলা চলে :

খিরাদ কা নাম রাখ দিয়া জুনুন
জুনুনকা খিরদ;
জো চাহে আপকা হুসন-ই-কারিশমা সাজ কারে।

উভয় ক্ষেত্রেই টেকনিকটি মূলত পশ্চিমা। তবে প্রথমটির রৈখিক সমন্বয় এবং দ্বিতীয়টির রঙের সমন্বয় নিঃসন্দেহে পরিপক্ব। রেখাচিত্রগুলোর আরবি নকশাভঙ্গিমা অবশ্যই প্রাচীন পাকিস্তানি ঐতিহ্যজাত। তবে ল্যান্ডস্কেপের ফর্ম ও জলরঙের টেকনিক স্পষ্টত পশ্চিমা।

আরেক ধরনের ছবিতে পূর্ব পাকিস্তানের লোকজ শিল্পের আদলে আঁকা ফিগারের ওপর স্থানের কিউবিস্টিক বিভক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রঙের সীমিত ব্যবহারও দেশজ শৈলী ও লোকজ চিত্রকলার আদলে এসেছে। উভয় ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ছবিটির মধ্যে দেশজ আবহ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। আমাদের পরিচিত পার্বত্য পল্লি, উপত্যকা, নারী-পুরুষদের দেহাবয়ব, বিশেষ ধরনের পোশাকে রঙের নকশা—সবই সুস্পষ্টত পাকিস্তানি। অন্তত কোনো বিদেশি নাগরিকই ভাববে না এসব ছবি কোনো ইউরোপীয় শিল্পীর আঁকা।

এবার সমালোচক যেসব প্রশ্ন তুলেছেন, সেগুলো ছেড়ে যেসব প্রশ্ন তিনি তোলেননি সেগুলোয় আসা যাক। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই রেখাচিত্রগুলোর কোন কোন বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দিতে হবে? ছবিগুলোর সৌন্দর্য প্রকৃতির নিষ্কলুষ দৃশ্যের মধ্যে কিংবা এসব দৃশ্যের হুবহু উপস্থাপনের মধ্যে নিহিত নেই। বিশেষ কিছু টেকনিক্যাল পদ্ধতিতে শিল্পী তাঁর ছবির মধ্যে যে নান্দনিক মূল্য সৃষ্টি করেছেন সেখানেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত সৌন্দর্য।

কাজেই যা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য তা হলো শিল্পীর রেখা ব্যবহারের পদ্ধতি—এ ক্ষেত্রে এসব রেখা শীতল এবং অনড় নয়, বরং উষ্ণ ও ছন্দোময় এ ছাড়া লক্ষ করতে হবে, তার একেকটি ফর্ম, যেমন—গাছ, কুঁড়েঘর, মানবশরীর ইত্যাদি তৈরি ও তা সাজানোর ধরন—এ ক্ষেত্রে এগুলো স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্দৃষ্টিজাত, কল্পনার তাপে জারিত; কল্পিত খসড়ার ছন্দোময় উত্থান, ভেঙে যাওয়া নকশা এবং প্রকাশবাদের এমন এক ঘোর যার মধ্যে নিরেটত্ব কম কিন্তু যা শূন্যে মেঘের মতো ধাবমান; লক্ষ করতে হবে, কীভাবে তিনি কাগজের ওপর বিভিন্ন বিষয় একটি ডিজাইন আকারে সাজান—কখনো সর্পিল, কখনো মোচাকৃতি, কিংবা চাকতির মতো, কখনো স্রেফ বৃত্তচাপের মতো, যেখানে অক্ষের মতো রেখা বিন্যস্ত থাকে। লক্ষ করতে হবে তাঁর রঙের ব্যবহার, আলোছায়ার সামঞ্জস্য কীভাবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, দূরত্বের কারণে সৃষ্ট টোনের ওঠানামা, স্পেস ও পরিবেশের অবভাস এবং অবশেষে দৃষ্টি দিতে হবে মাধ্যমটির ব্যবহার কীভাবে তিনি উন্মোচন করছেন এবং জলরঙের শরীরী গন্ধ কতটা কাজে লাগাতে পেরেছেন তিনি।

জয়নুলের রেখার কম্পোজিশন, ডিজাইন এবং রঙের ব্যবহার—সবকিছুতেই ফর্মালিজমের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ধ্রুপদি শিল্পের যেসব বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ নিরেট ফর্ম অথবা জটিল এবং নিখুঁত ভারসাম্যের ডিজাইন—এগুলো তাঁর ছবিতে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এখানে নান্দনিকতার স্বাদ খুঁজে নিতে হবে রেখার প্যাটার্ন, উপরিপাতিত তল, স্পেসের পরস্পর সম্পর্ক ইত্যাদির মধ্য থেকে। জয়নুলের ছবির মধ্যে গতি আছে। তেজোদীপ্তির ঝাপটা কাগজের ওপর দিয়ে বয়ে যায় এবং এক আসমানি মন্ত্রে তা পূর্ণ হয়ে ওঠে। ফর্ম এবং রেখার চাপ এবং পাল্টা

চাপ সৃষ্টি করে ছবির নিজস্ব নাটক। এটি কোনো প্লাস্টিক নয়, অতি অবশ্যই একটি গ্রাফিক শিল্প। জয়নুল আবেদিনের শৈলী অনেক ব্যক্তিগত হাতের লেখার মতো। রায়েল দুফির ক্ষেত্রে উপমাটা প্রয়োগ করা হয়েছিল। জয়নুলের হাতের লেখায় প্রাচীন প্রাচ্যকলার ক্যালিগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য আছে, যা আক্ষরিক নিরপেক্ষতাবাদকে উপেক্ষা করে খাঁটি সামঞ্জস্যের দিকে ধাবিত হয়।

যোগ্য ব্যক্তিদের মতামত

জয়নুল আবেদিনের ছবিতে কিউবিজম ও বিমূর্ততা নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার বদলে আমি বরং নিরপেক্ষ এবং যোগ্য বিদেশি সমালোচকদের মতামত তুলে ধরে আলোচনার ইতি টানব।

আর্টস অ্যান্ড লেটারস (লন্ডন)-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় এক দীর্ঘ নিবন্ধে রিচার্ড উইলসন বলেছেন, 'তাঁর গত দুই বছরের কাজ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অনুকরণ না করে বিমূর্ত ধারার কৌশলের সঙ্গে স্থানীয় ঐতিহ্যের সফল মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম ভারত ও পাকিস্তানের প্রথম শিল্পী তিনি।'

'স্বদেশবাসীর মধ্যে জয়নুলই যে প্রথম বিমূর্ত ধারার কৌশল ব্যবহার করছেন, এমন নয়। (উপমহাদেশের) আর্ট গ্যালারিগুলোয় এজাতীয় চিত্রশিল্পীর অভাব নেই। কিন্তু বাংলার দৃশ্যাবলি সম্পর্কে জয়নুল তাঁর বক্তব্য আরও স্পষ্টভাবে এবং পরিতৃপ্তভাবে প্রকাশের উপায় হিসেবে তিনি এটিকে ব্যবহার করতে পেরেছেন। অন্যেরা এ কৌশল ব্যবহার করেছে ইউরোপীয়দের মতো, ভারত ও পাকিস্তানিরাও যে এটি ব্যবহার করতে পারে, স্রেফ সেটা দেখানোর জন্য। জয়নুল বিমূর্ততার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি আত্মস্থ করতে পেরেছেন,

যেখানে পাকিস্তানের পল্লি এলাকাবিশিষ্ট প্রকৃতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতি রেখেই এ কৌশল প্রয়োগ করেছেন তিনি। আর এটি করতে গিয়ে তিনি এ কৌশলের এমন সব সম্ভাবনার দিক উন্মোচন করেছেন, এমনকি ইউরোপীয় ওস্তাদ শিল্পীরাও এত দিন যার সন্ধান পাননি। উপমহাদেশ এমন একজন শিল্পীর জন্যই প্রতীক্ষা করছিল, যিনি এ নতুন বিস্ময়কর টেকনিকটিকে তাঁর লাখো মানুষের কাছে অনুবাদ করে দেবেন।

'জয়নুল আবেদিন নিজেকে সেই ভাষ্যকার হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এ দাবি ন্যায্য। তিনি ডিজাইনে আগ্রহী এবং তাঁর ছবিতে গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এসব ডিজাইনের তীব্র নাটক সৃষ্টিতে তিনি দক্ষ। একটি নৌকা বেয়ে চলা দুজন মাঝির পায়ের বিন্যাস এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।'

এখানে আরেকজন সমালোচকের মতামত :

'এটিই জয়নুলকে তাঁর শক্তিমত্তা দেয়। একই সময়ে পর্যবেক্ষণ ও ধ্যানমগ্ন হওয়ার ক্ষমতা আছে তাঁর এবং তাঁর ব্রাশের গতি কখনো ইতস্তত করে না, স্লথ হয় না। এটি তাঁর ছবির উদ্দেশ্যের সঙ্গে খুবই সংগতিপূর্ণ। এ যেন এক প্রাচ্যদেশীয় হাত প্রাচ্যদেশীয় ভঙ্গিমায় ব্রাশ ধরে শোষক কাগজের ওপর শুধু কালো কালি ছিটিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার চোখটুকু ইউরোপীয়।

'নিজের মাধ্যমের ওপর জয়নুলের বিস্ময়কর নিয়ন্ত্রণ আছে। তিনি তাঁর ক্যানভাসের সম্মুখস্থ অর্ধেকখানি জায়গা ফাঁকা রাখতে পারেন, তবু তার মধ্যে স্পেস ফুটে ওঠে। এ ফাঁকা স্পেসটুকু দিগন্তে পাহাড়ের সারির দূরত্বে ক্ষুদ্রাবয়ব মানুষগুলোর দিকে চোখকে টেনে নিয়ে যায়। উইলসন স্টিয়ারও তাঁর জলরঙের ছবিতে এমনই কৃচ্ছ দেখাতে পারতেন। তবে স্টিয়ারের সেরা স্কেচগুলোর

মধ্যে নিঃসন্দেহে কোথাও প্রাচ্যদেশীয় কোনো উপাদান ছিল।'
—এরিক নিউটন।

আমাদের এ নিভৃত শিল্পীর কাজের সৌন্দর্য আবিষ্কারের জন্য কি আমাদের বহিরাগতদের সাহায্য প্রয়োজন হয়? আসুন, যার যতটুকু প্রশংসা প্রাপ্য, তা অকুণ্ঠভাবে দিই।

অনুবাদ : **শিবব্রত বর্মন**

প্রসঙ্গ : জয়নুল আবেদিন ৩

অকুণ্ঠ সমালোচনার বলি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

গত মাসে করাচিতে জয়নুল আবেদিনের একটি প্রদর্শনীর ওপর আমার লেখা একটি নিবন্ধ *ডন*-এ ছাপা হওয়ার পর সাম্প্রতিক সংখ্যায় একই পাতায় সেটির ভীষণ সমালোচনা করে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। আমি মনে করি, আমার মত সম্পর্কে অনাবশ্যক ভ্রান্ত ধারণা থেকে এ সমালোচনা করা হয়েছে।

আমার মনে হয়েছে, আমি যা বলতে চেয়েছি, তা লেখকের কাছে ভুলভাবে প্রতিভাত হয়েছে। আশা করি, এটি নিছক একটি নিরীহ ভুল, সুপরিকল্পিত আক্রমণ নয়।

তাঁর প্রধান আপত্তি জয়নুলের রেখাচিত্রের প্রতি আমার 'তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব'। তিনি ধারণা করেছেন, আমি জয়নুলকে পছন্দ করি না, কারণ রেখাচিত্রই শিল্পী হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি। এরপর তিনি হার্বার্ট রিড থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এমন একটি বিষয় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, যা আগে থেকেই সুস্পষ্ট। তা ছাড়া মজার ব্যাপার হলো, আমি নিজেই সেসব কথা বলেছি।

আমার নিবন্ধের কোথাও আমি রেখাচিত্রের প্রতি 'তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব' পোষণ করিনি। সমালোচক আমার নিবন্ধের একেবারে

শুরুর কয়েকটি বাক্য পড়লেই দেখতে পাবেন, আমি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি, শিল্পী জয়নুল আবেদিন যখন রেখাচিত্র আঁকেন, তখন তা খুবই 'মৌলিক কর্ম হয়ে ওঠে'। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরও বলেছি, কেউ যদি কেবল রেখাচিত্রের মাধ্যমেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যারা এমন আঁকিয়েদের অবমূল্যায়ন করতে চায়, আমি বরং তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছি, 'সব্যসাচীদের গুণকীর্তন ত্যাগ করে আমরা একালে বিশেষায়ণকে দুর্বলতার বদলে বরং শক্তিমত্তা বলে বিবেচনা করতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সর্ববিচারীদের দিন শেষ হয়ে গেছে। চিত্রকলা অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাই আজ যিনি ক্ষেত্র, ধারা বা শৈলীতে দক্ষতা অর্জন করেছেন, সেসব পৃথকভাবে বিবেচনা করাই যুক্তিসিদ্ধ।

এর ফলে লেখকের হার্বার্ট রিডের উদ্ধৃতি টানা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন, অবশ্য যদি না তিনি তাঁর মিথ্যা অনুমানকে জোরালো করার জন্য বুঝেশুনেই এ কাজ করে থাকেন। তাঁর অনুমান, যারা রেখাচিত্র আঁকে আমি তাদের শিল্পীর কাতারে গণ্য করি না। আর এ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তিনি আমাকে আক্রমণ করেছেন।

আরেক স্থানে লেখক রিচার্ড উইলসনের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি মনে করেন, এক বছর আগে জয়নুলের আঁকা বিমূর্ত চিত্রকর্মগুলো সম্পর্কে আমার মতামত উইলসনের মতামতের বিরুদ্ধে যায়। তিনি এটুকু অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন যে, 'যোগ্য ব্যক্তিদের মতামত' হিসেবে তিনি বিজয়ীর ভঙ্গিতে যেসব উদ্ধৃতি টেনেছেন, সেগুলো আমার নিবন্ধে বিবৃত মতামতকে উল্টো সমর্থনই করে।

সত্যি বলতে কি, এক বছর আগে বিমূর্ত ধারার এসব নিরীক্ষা দেখার পর এ নিয়ে আমি বিস্তর চিন্তাভাবনা করেছি। যে সময় আমি এগুলোর প্রশংসা করেছিলাম। আমার সাম্প্রতিক নিবন্ধেও আমি

একইভাবে সেগুলোকে সাধুবাদ দিয়েছি। এগুলোকে আমি উৎকৃষ্ট এবং অনুসরণীয় কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। এগুলো শিল্পীর সৃজনশীল প্রতিভাকেই শুধু নয়, সেই সঙ্গে একঘেয়ে ঐতিহ্যবাদিতা ছুড়ে ফেলে এমন কিছু সন্ধান করার ক্ষেত্রে শিল্পীর সামর্থ্যকে প্রকাশ করে, যা আরও একটি বিশেষ কারণে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। আর তা হলো : এসব শিল্প মাটির শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু হবে না। যেমন এ অন্বেষাই মাদুরের মতো ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি উপাদানের সঙ্গে বিমূর্ত ধারার সংযোগ ঘটিয়েছে। মিলিয়েছে সাপুড়ের ছন্দ এবং গাঁয়ের বধূর সঙ্গে কিউবিস্ট রেখাকে। স্থানীয়ভাবে তৈরি রং গিয়ে লেগেছে বিদেশি ক্যানভাসে।

রিচার্ড উইলসন বলেন, 'তাঁর গত দু বছরের চিত্রকর্ম দেখলে বোঝা যায়, নিছক অনুকরণের ওপর নির্ভর না করে বিমূর্ত ধারার কৌশল ও স্থানীয় ঐতিহ্যকে মেলানোর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী তিনিই প্রথম ভারতীয় ও পাকিস্তানি শিল্পী।' আমার মতামতের সঙ্গে এর কি কোনো বিরোধ আছে?

জয়নুলের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আঁকা স্কেচ এবং ইউরোপ সফরের সময়কার স্কেচের শৈলীটিকে আমি 'আমদানি করা হাড়গোড়' বলে অভিহিত করেছি। এবং একই সঙ্গে বিমূর্ত ধারার নিরীক্ষাগুলোকে মাটির সঙ্গে যোগসূত্রপূর্ণ বলে অভিহিত করেছি বলে আমার সমালোচক বিস্মিত হয়েছেন।

আমার বিশ্বাস, তাঁর এ বিস্ময়ের উৎস ইউরোপের দুটি প্রধান ধারার ব্যাপারে আপাতবিভ্রান্তি। একটি ধারা আধুনিক চিত্রকলা নামক একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়ে নিজে মৃত্যুশয্যায় শুয়েছে। আমি নিশ্চিত, এ ব্যাপারে তিনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে আমাদের দেশে গত কয়েক দশকে আমরা ছবি আঁকার যে পদ্ধতিটি গ্রহণ

করেছি, সেটি পুরোদস্তুর পশ্চিমা। এই পশ্চিমা ধারাটি নিজেই পরিবর্তিত হচ্ছে। বাস্তববাদের ধরন পাল্টে গিয়ে তার জায়গা নিচ্ছে আধুনিক ধারা, যা প্রাণবন্ত ও গতিশীলতার কারণে পুরো শিল্পের ধারণাটিতেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ডেকে আনছে। আমাদের সামনে এখন স্পষ্টত দুটি পথ খোলা : হয় মুমূর্ষু ধারাটি আঁকড়ে ধরে থাকা, নতুবা লাফিয়ে আধুনিক ধারাটি ধরে ফেলা। বর্তমান সভ্যতার গতিপ্রকৃতি বিচারে বলতে হয়, অন্য অনেক কিছুর মতোই শিল্পকেও একটি সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি পরিগ্রহণ করতে হবে। সাধারণ বুদ্ধি বলছে, শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও আমাদের নিজেদের চিত্রশিল্পকেও শেষ পর্যন্ত এ নতুন ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। যদি মুমূর্ষু ধারাটিই আমরা আঁকড়ে ধরে থাকি, যেটিকে আমি হাড়গোড় হিসেবে আখ্যায়িত করেছি, সে ক্ষেত্রে আমরা আমাদের শিল্পের বিকাশকে শুধু খর্বই করব।

শিল্পের সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমার মতামতটি আমার সমালোচক পরে বুঝতে ব্যর্থ হন, এ জন্য আমি ব্যাখ্যা করে বলছি যে প্রাচীন চীন, পারস্য ও ভারতে শিল্পধারার যে তফাত আমরা দেখি, তার মূল কারণ তখনকার দিনে সভ্যতাগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন। বর্তমান সময়ে দেশে দেশে দূরত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় এসব বিসদৃশ ধারা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ধীরে ধীরে একটি সর্বজনীন ধারা তৈরি করছে। এ কারণে তথাকথিত মডার্ন ফ্রেঞ্চ স্কুল অব পেইন্টিং গঠিত হয় বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের দ্বারা, যাদের মধ্যে একজন জাপানিকেও পাওয়া যায়। এ কারণে আজকের দিনে পিকিং, ব্যাংকক, লন্ডন, নিউ ইয়র্ক ও করাচিতে চিত্রকলা দেখতে একই রকম।

আমি আশা করি, এতক্ষণে আমার সমালোচক স্বীকার করে নিয়েছেন, আমার বক্তব্যের মধ্যে কোথাও স্ববিরোধ ছিল না। আমি এ-ও আশা করি যে আমার যে মন্তব্যটি তিনি প্রচুর বিস্ময় ও

প্রশ্নচিহ্নসহ উদ্ধৃত করেছেন, সেটির বক্তব্যের সঙ্গে তিনিও একমত হবেন। সেখানে আমি বলেছি, 'আমাদের এটুকু অবশ্যই বুঝতে হবে যে, অপরিবর্তনীয় এবং অনড়ভাবে ঐতিহ্যের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি ঘটালে শিল্প-সংস্কৃতি পুষ্পিত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন গ্রাহ্য সংশ্লেষণের মাধ্যমে গতিশীল ও প্রাগ্রসর একটা কিছুতে ঐতিহ্যের রূপান্তর।'

আমার আরও বিশ্বাস, এটিকে সাধারণভাবে গৃহীত একটি সত্য হিসেবে স্বীকার করে নেবেন আমার সমালোচক। ভ্রু কুঁচকে কিংবা অর্থহীন মন্তব্য ছুড়ে দিয়ে এটির সত্যতা লঘু করা যাবে না। ফলে কোনো যুক্তি খণ্ডন হবে না। বরং এর ফলে অজ্ঞতা ও কুরুচিই প্রকাশ পাবে।

তবে আমার মতামতের যতটুকু মূল্য, আমার সমালোচকের মতামতের মূল্য তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, সেটা ঐতিহ্যবাহী বা বিমূর্ত ধারার শিল্পের বিকাশ-প্রক্রিয়া নিয়েই হোক আর জয়নুলের পার্বত্য চট্টগ্রাম-বিষয়ক ছবিগুলোকে বাস্তববাদী বলার যুক্তি থাকা-না-থাকা নিয়েই হোক। (তিনি বলছেন, 'এগুলো বাস্তববাদী নয়', তবে আমার জানা নেই কল্পনাশক্তির কোন জোরে তিনি এমন বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে যেতে পারছেন)।

তাঁর এ ধারণা পোষণের পূর্ণ অধিকার রয়েছে যে জয়নুলের রেখাচিত্রগুলো চমৎকারভাবে আঁকা, ঠিক যেমনটা আমার মনে করার অধিকার আছে, এগুলো চমৎকার নয়। এবং ১৯৪৩ সালের দিকে আঁকা তাঁর দুর্ভিক্ষের বিস্ময়কর স্কেচগুলোর তুলনায় এগুলো খুবই হতাশাব্যঞ্জক। এর মানে এই নয় যে, তার পরের রেখাচিত্রগুলো ভালো হতে পারবে না কিংবা আমরা যদি তাঁকে বিভিন্ন ধারার মধ্যে ইতস্তত করতে দেখি, তবে তা উল্লেখ করব না।

পরিশেষে, আমি এটুকু যোগ করতে চাই যে আমি মনে করি, সমালোচক আমার নিবন্ধটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে এত ভুল ধারণা পোষণ করার অবকাশ পেতেন না, যদি তিনি বুঝতে সক্ষম হতেন যে আমি শুধু জয়নুলের সাম্প্রতিক রেখাচিত্রগুলোরই সমালোচনা করেছি, যেগুলো তাঁর এক বছর আগেকার প্রতিভাদীপ্ত কাজগুলোর তুলনায় খুবই উদ্দেশ্যহীন ও অসার। ফলে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হই যে, শিল্পী পরস্পরবিরোধী ধারার মধ্যে ছুটোছুটি করছেন। সমালোচক আমার অবস্থানের সঙ্গে একমত না-ও হতে পারেন। তবে এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ফলে জয়নুল আবেদিন আসলে বিভ্রান্ত সমালোচনার নয়, বরং সাদামাটা, আড়ালহীন সমালোচনার বলি হয়েছেন।

অনুবাদ : **শিবব্রত বর্মন**

আমাদের কয়েকজন শিল্পী

পূর্ব পাকিস্তানের এ আমলের শিল্পীদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে, তা হলো, তাঁদের ছবিতে আঞ্চলিকতার অনুপস্থিতি। বলা কঠিন, এসব শিল্পীর ইজেল-নিঃসৃত শিল্পকর্মগুলো কোনো বিশেষ ধারা বা প্রবণতার কথা জানান দিচ্ছে কি না। তবু নিরাপদে এটুকু নিশ্চয়ই বলা চলে যে, ছবিগুলো সৃজনশীলতার এমন এক তেজ, এমন এক উদ্দীপনার স্বাক্ষর বহন করছে, এ অঞ্চলের শিল্পকলার বিবর্তনের কোনো স্তরেই যার তুলনা পাওয়া যাবে না।

পূর্ব বাংলার আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে পথিকৃৎ নিঃসন্দেহে জয়নুল আবেদিন। তিনি শক্তিমান শিল্পী। রঙের ওপর তাঁর দখল চমৎকার। নিজের শিল্পী হয়ে ওঠার শুরুর পর্যায়েই তিনি যে শিল্পসমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন এর মূল কারণ, ওই সব দিনের ঠান্ডা, নির্জীব ছবিগুলোর মধ্যে তিনি টাটকা বাতাসের এক ঝাপটা বইয়ে দিয়েছিলেন। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি অসামান্য লুব্ধ চোখে এঁকে গেছেন পূর্ব বাংলার নিসর্গচিত্র, যার সহজাত কোমলতা তাঁকে ভীষণ মুগ্ধ করেছে বলে মনে হয়। তাঁর ল্যান্ডস্কেপগুলো ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে যে আবেদন জাগায় তা অপ্রতিরোধ্য।

যে পর্যায়ে জয়নুল দুর্ভিক্ষের অজস্র স্কেচ এঁকেছেন, তার পরপরই তাঁর আঁকাআঁকির ক্ষেত্রে বেশ দৃষ্টিগোচর এক ছেদ পড়ে। তিনি আবার তাঁর জলরং আর তেলরঙে ফিরে এসেছেন। তবে এখন তাঁর ছবির কম্পোজিশনের জৌলুশ আর নিরেটত্বের পেছনে এক বিষাদের ছায়া চোখে পড়ে। জয়নুলের দৃষ্টি যেন এখন প্রেততাড়িত।

জয়নুলের এক সাম্প্রতিক জলরঙে দেখা যায়, কায়েদে আজমের সাদামাটা মাজারের দিকে এগিয়ে চলেছে শোকার্ত, বিষাদময় একদল মানুষের নীরব মিছিল। ছবিটি এক জাতীয় ট্র্যাজেডিকে ধারণ করে আছে। এর মধ্যে ফুটে উঠেছে কায়েদে আজমের প্রতি জনতার গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন।

জয়নুল আবেদিনের চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদের প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হতে শুরু করে ঠিক সেই সময়টায়, যখন আকস্মিক খ্যাতির সূর্যে রৌদ্র পোহাতে শুরু করেছিলেন জয়নুল। যদিও জীবনের ভরাট নকশার ওপর তাঁর দখল জয়নুল আবেদিনের চেয়েও গভীর বলে মনে হয়, তবু সফিউদ্দীন যেন কী এক ব্যাখ্যাতীত শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছেন বলে মনে হয়। আর এই দোটানার ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং তাঁর ছবি প্রায়শই হয়ে উঠছে নস্টালজিক স্বপ্নের এক খোদাই করা পাথর। তাঁর ছবিতে গভীর অবিন্যস্ত কাব্যিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। তাঁর ছবির অনুপুঙ্খতা, রঙের অবাক করা মুনশিয়ানা আর মাঝেমধ্যে প্রাক-রাফায়েল যুগের রৌদ্রময় শিল্পীদের উজ্জ্বল প্রতিফলন সত্ত্বেও শিল্পী সফিউদ্দীনের বহুবর্ণিল ডিজাইনের পুরোটা দেখলে মনে হয়, তা বাইরের চেয়ে ভেরের দিকে টানছে। ছবির বিষয় যা-ই হোক না কেন—দীর্ঘ

ইউক্যালিপটাস গাছের সারি ধরে ঘর-ফিরতি ষাঁড়ের দল কিংবা ওম-জাগানো নীড়ে বসা দুটি ঢুলু ঢুলু পাখি—তাঁর ছবিতে সর্বদা এক অপ্রবেশ্য দূরবর্তিতা থাকে।

জয়নুল আবেদিনের মতো সফিউদ্দীনের ছবিও লন্ডন, প্যারিস ও সিঙ্গাপুরে প্রদর্শিত হয়েছে এবং তাঁরও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। সন্দেহ নেই, এ দেশের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সফিউদ্দীন এক নতুন পথ খুলে দিয়েছেন। কেননা যেটিকে শিল্পকর্মের কৌশলগত আঙ্গিক বলা যায়, সেটির ওপর এত দক্ষতা এর আগে কোনো শিল্পীই অর্জন করতে পারেননি। কয়েক বছর ধরে তিনি একোয়াটিন্ট ও ড্রাইপয়েন্টের ওপর দক্ষতা অর্জনে ব্যস্ত রয়েছেন। কাঠখোদাইয়ের ওপরেও তাঁর ভালো হাত। শৈল্পিক আবেগ সঞ্চারের কারিগরি রূপটির প্রতি তাঁর এই যে বৈচিত্র্যময় আগ্রহ, এটি তাঁকে ছন্দ ও বর্ণের সহজাত প্রকরণ চষে ফেলার কাজে সহায়তা করেছে। তাঁর শিল্পকর্মের মূল উপাদান তাই ফর্মালিজম নয় বরং জানা ও অজানা আবেগের মধ্যে যে আদান-প্রদান ঘটে চলেছে, তার অনুসন্ধানই সফিউদ্দীনের ছবির ভিত্তিভূমি। আর শুধু এ কারণেই তাঁর নিসর্গচিত্র বিরল। বিহারের সাঁওতাল পরগনার বিরান প্রান্তরের প্রকৃত নিসর্গচিত্র আঁকার যে চেষ্টা তিনি আগে করেছিলেন, তা বৃথা গেছে। ইদানীং পূর্ব বাংলার নদীতীরের যেসব নিসর্গচিত্র এঁকেছেন, সেগুলোতেও অগ্রগতির ছাপ নেই। এই ব্যর্থতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এক সুস্পষ্ট প্রেরণার অস্তিত্ব। এ প্রেরণা প্রত্যক্ষ নয়। আর এ কারণেই তাঁর সূক্ষ্মতাপ্রিয়, নির্জন হৃদয়ের প্রকাশতৃষ্ণার মধ্যে একে পাওয়া যাবে না।

একটু কম নামজাদা কিন্তু প্রতিভাবান শিল্পীদের মধ্যে প্রথম চলে আসে কামরুল হাসানের নাম। কামরুল নিজের মধ্যে জীবনের

দেহগত প্রাচুর্যকে উদ্‌যাপন করার ক্ষমতার সঙ্গে মিলিয়েছেন সংবেদনশীল শিল্পিত মনের ইন্দ্রিয়প্রভা। তাঁর প্রকাশভঙ্গি সহিংস ও রক্তিম। এই তীব্রতার স্থূলতা সৌভাগ্যবশত লঘু হয়ে যায় শিল্পীর প্রকাশের শক্তির ওজস্বিতার গুণে।

এর পরই বোধ করি আসে আনোয়ারুল হকের নাম। স্বল্পপ্রজ এই শিল্পীর ছবিগুলো তাঁর সুনির্দিষ্ট ও পছন্দনীয় শৈলীর অস্তিত্ব ঘোষণা করে। সবার আগে যা তাঁর ছবিতে চোখে পড়ে, তা হলো শিল্পের জন্য শিল্পীর অপ্রচলিত সব বিষয় নির্বাচন। এ প্রবণতার কারণে শিল্পী চলে গেছেন বরফাচ্ছাদিত পর্বতাঞ্চলে। ব্রাশের সাহায্যে ধরে ফেলার চেষ্টা করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা কোনো দৃশ্য। হয়তো কোনো সরু কাঠের ব্যালকনি। পেছনে মেঘাচ্ছন্ন একফালি চৌকোণ আকাশ। অথবা বিস্তীর্ণ সিঁড়ির মতো উঠে যাওয়া চায়ের বাগান কিংবা এমন এক পাঠানের পোর্ট্রেট, যার চোখ, মুখ, দাড়ি সবকিছুতেই এক কৌণিক তীক্ষ্ণতা। পূর্ব আফ্রিকার অভ্যন্তরে কাটানো শৈশবের অসুখী দিনগুলোর স্মৃতি তাঁকে এখনো তাড়া করে ফেরে। শিল্পী, বোধ করি, মনে করতে থাকেন, তাঁর ছবির প্রকৃত বিষয়বস্তুগুলো তিনি সেখানেই ফেলে এসেছেন। সেই দূর শৈশবে প্রকৃতি এক অমলিন, জমকালো সাজে সজ্জিত হতো। আনোয়ারুল হকের বর্ণবিন্যাস অনুজ্জ্বল। উজ্জ্বল রঙের প্রতি তাঁর অপছন্দের কথা তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করছেন। রঙের ঔজ্জ্বল্যের বদলে তিনি তাঁর শিল্পকর্মকে এক অন্তর্গত বিভায় উজ্জ্বল করে তুলতে চান।

নিজের লক্ষ্যের প্রতি ধ্যানী নিবিষ্টতার কারণে খাজা শফিক আহমেদ শিল্পরসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি সেই ধরনের শিল্পীদের একজন, যাঁরা সৌন্দর্যকে তার সবচেয়ে সম্ভাব্য,

সবচেয়ে প্রত্যাশিত জায়গাটায় না খুঁজে খোঁজেন সবচেয়ে অনিশ্চিত জায়গাটিতে: সেইখানে, যেখানে সৌন্দর্য থাকে লুক্কায়িত। এই তুলে আনা সৌন্দর্য সে কারণেই হয় মোহময়। নিসর্গচিত্র তাঁর চোখে ধরা দেয় ধোঁয়াটে, অনির্দেশ্য হয়ে। প্রতিটি আলাদা বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রিত করা হয় না। পুরো দৃশ্যটির সৌন্দর্যের কাছে তাদের পৃথক অস্তিত্ব যেন মূল্যহীন। তাঁর চিত্রে এগুলোরই প্রতিফলন। তাঁর নিসর্গচিত্রগুলোর অমসৃণ কাঠামোর পেছনে দর্শক খুঁজে পান এক কোমল সৌন্দর্যের উপস্থিতি।

অনুবাদ : **শিবব্রত বর্মন**

বাহারদা

হবীবুল্লাহ্ বাহার আমার আত্মীয় ছিলেন। তাঁকে বাহারদা ডাকতাম। যতদূর মনে পড়ে ঐ নামে তাঁকে সম্বোধন করতে মনে হয় তিনিই মত প্রকাশ করেছিলেন। একেবারে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না, কখনো একত্র বসবাসও করিনি। তবু সে-আত্মীয়তার সূত্রে অল্পবয়সেই তাঁকে জানার সুবিধে হয়েছিলো এবং এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সে-বয়সে আত্মীয়-অনাত্মীয়দের মধ্যে এমন কাউকে জানতাম না বলে তখনই আমার মনে তিনি একটি বিশেষ স্থান দখল করেছিলেন, হয়তো আমাকে প্রভাবিতও করেছিলেন, অন্ততপক্ষে জীবনের এক নতুন ক্ষেত্রের প্রতি আমার মন আকর্ষণ করেছিলেন। বিশেষ করে সে-কথা মনে হলো বলেই তাঁর সম্বন্ধে দুটো কথা লিখতে বসেছি। তবে লিখতে বসেই মনে হচ্ছে যে তিনি নিজেকে জীবনের একটি ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। আত্মীয় হয়ে তাঁর সম্বন্ধে লেখায় সুবিধে-অসুবিধে দুই-ই আছে। সুবিধাটা আসে আত্মীয়তার সূত্রে মানুষটিকে নেপথ্য থেকে জানার সুযোগ থেকে। নেপথ্যে যাকে জানা যায় তাঁর সম্বন্ধে যে-জ্ঞান জন্মে সে জ্ঞানে আসল মানুষের পরিচয় মেলে : সে মানুষ রক্তমাংসের মানুষ। সে-মানুষের মনের দ্বন্দ্ব-সংশয় আশা-নিরাশা স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার কথা জানা যায়। তবে সে-জ্ঞানে আবার বাধা সৃষ্টি করে যখন তার

বাইরের কাজকর্মের বিচারের চেষ্টা করা হয়। আত্মীয়রা ভুলে যায় মানুষ দ্বন্দ্ব-সংশয় আশা-নিরাশায় তৈরি হলেও যারা সমাজের বা মানুষের কাজে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তারা মঞ্চে সে-দ্বন্দ্ব-সংশয় আশা-নিরাশা দেখান না, নিশ্চিত তাই দেখায়। শত দ্বন্দ্ব-সংশয় থাকলেও মানুষের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। তাছাড়া দুনিয়ায় কিছুরই নিশ্চিত উত্তর নেই, তবু মানুষকে মনস্থির করতেই হয়। তবে আত্মীয়দের পক্ষে সে-কথা মনে রাখা দুষ্কর: মানুষটির নেপথ্যে দেখা জীবনই তাঁর চোখে বার-বার বড় হয়ে দাঁড়ায়, দুই জীবনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বাহাদার কথা যখন ভাবি তখন একটি বিশেষ কথা মনে হয়। তিনি যুবক বয়সে যেমন ছিলেন পরে তেমন ছিলেন না। সব মানুষই বদলায় সময়ের চাপে। সে ধরনের পরিবর্তনের কথা বলছি না। অল্প বয়সে যে উৎসাহ থাকে, সে উৎসাহ পরে স্তিমিত হয়ে যায়। সেটা নিতান্ত দৈহিক ব্যাপার। মানসিক হলেও সাধারণ ক্ষেত্রে সাংসারিক পারিবারিক নানা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। তার ক্ষেত্রে সে পরিবর্তনের কারণ তেমন কিছু ছিল তা কখনো মনে হয় নি। মনে হয়েছে যে বিশ্বাসের ওপর তাঁর নবীন জীবন গড়ে উঠেছিল, সে-বিশ্বাস পরে ভেঙ্গে গিয়েছিলো, যা হবে ভেবেছিলেন তা হয় নি। সে-বিশ্বাসের ক্ষেত্র ছিল সমাজ জাতি দেশ, নিজের ব্যক্তিগত জীবন নয়। সে-জন্যে তাঁর পরিবর্তনের ব্যাপারটা উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁর নিজের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে তা অনুভব করলেও কী কারণে এমন করে সেটি ঘটেছে তা কখনো বলেন নি। যারা তাকে জানতেন তারা এ কথা জানেন যে তিনি অনর্গল কথা বলতেন। সে-কথা মনে হলে কখনো-কখনো ভাবি, মুসলমান সমাজের দীর্ঘ তমসার [পর] যারা সর্বপ্রথম কথা বলতে

শুরু করেন তাদের অন্যতম তিনি। মুসলমান সমাজের দীর্ঘ রাত তাঁরাই ভেঙ্গেছেন, দীর্ঘ রাত শেষ হয়েছে তাই [...] রাত্রিশেষে পাখির কলরবের মতো হয়তো শুনিয়েছে তাদের কণ্ঠধ্বনি। তিনি এত কথা বলতেন যে যাদের হাতে সময় নেই তারা একবার তাঁর খপ্পরে পড়লে আর নিস্তার পাবেন না এই ভয়ে তাঁকে এড়িয়ে যেতেন। ট্রাম স্টপে ট্রাম ধরতে গিয়ে তাঁকে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। একটার পর একটা ট্রাম চলে যাচ্ছে। তিনি ট্রাম ধরছেন না কারণ ট্রাম ধরতে যারা আসছে তাদের [...] নিয়ে গল্পগুজব শুরু করেছেন। ট্রাম স্টপ এমন একটি জায়গা যেখানে লোকের সঙ্গে দেখা হয়ই। কে জানে, হয়তো সে-জন্যেই তিনি ট্রাম স্টপে হাজির হতেন। সত্যিই যদি কোথাও যাওয়ার ছিল তবে এমন ভাবে পাশ দিয়ে ট্রামের পর ট্রাম চলে যেতো কি? তবে যে-কথাটা বলছিলাম সেটি এই যে, তিনি অনর্গল এত কথা বলতেন নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতেন না, তিনি যে আসলে কী ভাবছেন, কোথায় তিনি হতাশ হয়েছেন, কোথায় তার আশা চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে—সে-সব কথার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যেতো না। মনে হয়, মনের কথা বলতেন না কারণ জানতেন তাঁর মনের কথা কেউ ঠিক বুঝবে না। তিনি একটি বড় কঠিন যুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন কোথাও কিছুতে দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্বাস বজায় রাখা সহজ ছিল না। সে যুগে গৌরচন্দ্রিকারই গলদ হতো পদে পদে। তাঁর হয়তো এই ভয় হতো যে, ভুল জেনেও তা স্বীকার করা সম্ভব নয় কারণ কোথাও কোনো অবলম্বন নেই। একটা ছাড়লে অন্য আরেকটা কিন্তু ধরবো—এমন অবস্থা ছিল না দেশের।

জ্ঞান হওয়া অবধিই হয়তো তাঁর কথা শুনেছি। কী শুনতাম তা মনে নেই, তবে তখনই বুঝেছিলাম যে আমাদের পরিবারের

গতানুগতিক জীবনধারায় তিনি একটু বেসুরো রব তুলেছেন, যার একমাত্র কারণ এই যে কলেজে পাস দিয়েও অন্যদের মতো সরকারি বেসরকারি কোন চাকুরীতেই যোগদান করেন নি। তাঁর সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয় (আগে হলেও স্মরণ নেই) তখন আমি বালক মাত্র। সে সাক্ষাতের কথা এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। চট্টগ্রামে আমরা ছুটিতে এসেছি, তিনিও বেড়াতে গেছেন। আমি একটি টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে, তিনি সে-টেবিলেরই উপর বসে ফুটবল খেলার কলাকৌশল আইন-কানুন বিস্তারিতভাবে আমাকে বোঝাচ্ছেন। সেটাই সর্বপ্রথম স্মৃতি : আমার সামনে চেয়ারের উপর বসে কথা বলছেন। কীভাবে সে-টেবিলে এসে উঠেছেন তাও বলতে পারবো না। তিনি সুপুরুষ ছিলেন। স্বাস্থ্যসজীব ফর্সা চেহারা, খুঁতহীন মুখের রেখা, জীবন্ত চঞ্চল চোখে কৌতুকচ্ছটা, গালে জুলপির মত, ঐ বয়সেই মাথায় টাক। ফুটবলের কলাকৌশল কতটা কানে গিয়েছিল কতটা বুঝেছিলাম জানি না, তবে বয়সে যাকে এত বড় মনে হয়েছিল এবং যার ব্যবহারে অপরিচিত জগতের খোলামেলা ভাব এবং বুদ্ধিদীপ্ত চেহারায় কী একটা অভিজ্ঞতার নিশ্চিততা—তিনিই যে আমাকে ফুটবল কলাকৌশল শেখাচ্ছেন সে-অভিনব উপলব্ধিতেই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। এমনটা আমার জীবনে আগে কখনো ঘটেনি। বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে গল্পকাহিনী শুনেছি, হিতবাদ শুনেছি, কিন্তু খেলার বিষয়ে এমন তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা কারো কাছে শুনি নি। তাছাড়া, শুনতে শুনতে মনে হয়েছিলো, বয়োজ্যেষ্ঠরা যখন কিছু বলেন তখন তাঁরা বক্তাশ্রোতার মধ্যে বয়সবিভেদের কথা ভুলতে দেন না। বাহারদা এমনভাবেই কথা বলছিলেন যে আমাদের মধ্যে যেন বয়সের প্রভেদ নেই। শুধু তাই নয়। ফুটবল খেলা শুধু যে বল নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করা,

হৈহুল্লোড় করা বা অপরপক্ষকে হারানো নয়, সেটা এক ধরনের বিজ্ঞান, সে-কথাই সহসা বলেছিলেন—কথাটা অত পরিষ্কারভাবে তখন বুঝি নি, কিন্তু সব কিছুর মধ্যে যে সুব্যবস্থিত পদ্ধতি আছে উৎকর্ষতা যা ব্যতীত হয় না তারই প্রতি সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমাদের জীবন অশৃঙ্খল; খোদা বা ভাগ্যের ওপরই আমরা নির্ভর করি আমাদের উন্নতির জন্যে তো বটেই, দুবেলার খোরাকের জন্যেও। তিনি যে আমাকে ফুটবল খেলোয়াড়ে পরিণত করতে চেয়েছিলেন তা নয়, ওই অমূল্য উপদেশটি দেবার জন্যে টেবিল সওয়ার হয়ে সে-খেলার কথা পেড়েছিলেন। পরে আরেক ব্যাপারে তিনি আমাকে সচেতন করেন। সেটি এই যে, যে-কোনো সৃষ্টির জন্য মৌলিক কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। একদিন তিনি আবিষ্কার করেন আমার লিখবার সাধ। বড় বড় অক্ষরে কচি হস্তে ছোটগল্প লিখতাম সে বয়সেই। কথাটা আবিষ্কার করার পর থেকে দেখা হলেই তাঁকে আমার লেখা দেখাতে বলতেন, আমিও কম্পিত হৃদয়ে আমার নূতন লেখা তাঁকে এনে দিতাম। একদিন আমার লেখায় একটি উপমা দেখে তিনি ভয়ানকভাবে উৎসাহিত হয়ে পড়েন। রক্তাক্ত সূর্যাস্তের বর্ণনা দিতে লিখেছিলাম, আকাশে কে যেন জলছবি সেঁটে দিয়েছে। উপমাটি তাঁর এতই ভালো লাগে অনেকদিন ধরে অনেককে সে-কথা বলেছেন। তবে এতে আমার আনন্দ হয় নি, বরঞ্চ গভীর লজ্জাই বোধ করেছি এই কারণে যে উপমাটি আমার নিজস্ব ছিলো না, কোথায় যেন পড়েছিলাম। ঐ বয়সে পাঠ্যপুস্তকে পড়া জিনিস আবার নিজের হাতে লিখতে শেখে ছেলেমেয়েরা। অতএব নিজের গল্পে অন্যের উপমা ব্যবহার করেছি—তাতে হয়তো অন্যায় কিছু দেখতে পাইনি। তবে সে-উপমাটি যে আমার নিজস্ব নয়, তাঁর উৎসাহের যে যথার্থ কোনো

কারণ নেই সে-কথা বলে উঠতে পারিনি। তবে উল্লেখ করলাম নৈতিক পদস্খলনের একটি দৃষ্টান্ত দেবার জন্য নয়, ঐ উপমাটি নিয়ে তাঁর প্রচণ্ড উৎসাহ-আনন্দের মধ্য দিয়ে একটি কথা শিখেছিলাম তাই বলতে। কথাটি এই যে উপমাটি তাঁর নিকট এত ভালো লেগেছিলো তার যথার্থতার জন্য নয়, তাতে মৌলিক কল্পনাশক্তির একটি নমুনা দেখতে পেয়েছিলেন বলে। অন্যের উপমা চুরি করে আবার সে-বিষয়ে নীরব থেকে অন্যায় করলেও সেদিন শিখেছিলাম মৌলিক কল্পনাশক্তি কত বড় জিনিস।

অনেক কিছু হয়তো শিখেছি তাঁর কাছে, কিন্তু তা হয়তো স্পষ্টভাবে বুঝি নি সব সময়ে। তবে তাঁর বিষয়ে আমার সে-প্রথম স্মৃতিটি—তিনি টেবিলের ওপর বসে বক্তৃতা দিচ্ছেন—সে-স্মৃতিটায় একটা গূঢ় অর্থ যেন। সে-দৃশ্যটির মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকের ছবিই স্পষ্ট। তিনি কিছু না বললেও শিখেছি, কারণ যে-ধরনের জীবন গ্রহণ করেছিলেন তিনি, সে-জীবনের দিকে তাকালেই শেখা যেতো। সে জীবন শুধু যে স্বাধীন ছিলো তা নয়, তা দেশ সমাজের উন্নতির জন্যে উৎসর্গ করার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল তাতে।

কলকাতায় তাদের ২১ নম্বর ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রীটের বাড়ীর কথা মনে পড়ে। তখনো আমার বালক বয়স। আব্বার সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য সে-বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলাম। ফটক পেরিয়ে উঠানের পর সামনেই নিচের তলায় একটি ঘর যা ছিল তাঁর আপিস-বৈঠকঘর-লাইব্রেরী। ঘরের মধ্যখানে টেবিল, যার উপরিভাগ ঠিক নজরে পড়তো-না তাতে স্তূপাকার হয়ে থাকা অসংখ্য বইপত্রের জন্য। শুধু টেবিল নয়, আলমারি মেঝেতে ছড়িয়ে অসংখ্য বই, আরো অনেক বইপত্র, সব পড়ে আছে বিশৃঙ্খলভাবে। বইএর এমন এমন বিশৃঙ্খলতা আগে কখনো দেখিনি। তবু সে

বিশৃঙ্খলতা অভিনব মনে হয়। কী রহস্য তাতে। মায়ের কড়া শিক্ষার ফলে ধুলাবালির প্রতি সে-বয়সেই একটা বিরূপভাব জন্মেছিলো। কিন্তু যে-ধুলার একাধিক প্রলেপ তাঁর টেবিলের ওপর স্তূপাকার হয়ে থাকা বইপত্র ঢেকে রেখেছিলো, সে-ধুলাও মোহিত করে আমাকে। সে-ধুলা অপবিত্র তো নয়ই, বরঞ্চ তাতে অজানা বিচিত্র জগতের জ্ঞানবিদ্যার স্পর্শ। এর আগে বাহারদাকে তাঁর নিজের পরিবেশে কখনো দেখি নি। বইপত্রের বিশৃঙ্খলতার মধ্যে দিয়েই এবার তাঁর সত্য পরিচয় পেলাম যেন। বুঝলাম, তিনি অন্যের মতো নন, তাঁর জীবন থেকে তিনি যা আশা করেন সে-আশা দশজনের মতো নয়। এক কথায় যে-ধারাবাহিক জগতের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার পরিচয় হয়েছিলো সে-জগতের বাসিন্দা তিনি নন। আগে কোন বাড়িতে বই দেখি নি যে তা নয়। তবে অন্যেরা বই সাজিয়ে রাখে সেল্ফ-আলমারিতে। বইএর প্রতি তাদের যেভাব সে ভাবটা যেন শ্রদ্ধার, বই এমন জিনিস যার প্রতি অবহেলা দেখানো যায় না। তার নিত্য ব্যবহারও অনুচিত। তাছাড়া বইয়ের আসল কাজ যেন মানুষের জীবনের একটি অধ্যায়ের বিষয়ে সাক্ষী দেয়া: পাঠ্যজীবনের। সে-জীবন শেষ হলে ইস্কুল-কলেজের সার্টিফিকেট-ডিগ্রির মতো সে-গুলো তুলে রাখতে হয় প্রদর্শনের খাতিরে—সে-সবের আর প্রয়োজন নেই। বাহারদার ঘরময় ছড়িয়ে থাকা বইপত্রের দিকে তাকিয়ে মনে হয় বইএর সঙ্গে মানুষের যোগাযোগটা চিরদিনের, চাকুরী পেলেই বইএর প্রয়োজন শেষ হয় না। তাছাড়া বই মানুষের চেয়ে বড় নয়, তার প্রতি পৌত্তলিকতার ভাবও অযথার্থ। বইএর সঙ্গে আমার একটা সুস্থ স্বাভাবিক পরিচয় ঘটে সেদিনই।

হবীবুল্লাহ্ বাহার সম্বন্ধে ভাবলেই যে-সময়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল

বা শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছিলেন সেই সময়ের কথা না ভেবে পারা যায় না। সেদিনের কথা মাত্র, তবু কত যুগের প্রভেদ যেন। প্রথমে বলেছিলাম আমার একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়ে। সেটি এই যে, যে-আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনা নিয়ে তিনি সমাজসেবার কাজ শুরু করেছিলেন, সে-আশা-আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দীপনা শেষ পর্যন্ত থাকে নি : একটা গভীর নিরাশার ভাব নিয়েই শেষের জীবন কাটিয়েছেন। যে-মুসলমান সমাজ অধঃপতনের কালো পানিতে তলিয়ে গিয়েছিলো, সে-সমাজের দুরবস্থাই চিরদিন তাঁকে নিপীড়িত করেছে। তবে যুবাবয়সে তাঁর মনে হয়েছিলো হঠাৎ যেন সে-সমাজে জাগরণ এসেছে। এবার কয়েকজন আত্মত্যাগী নিঃস্বার্থ মানুষ যদি সে-সমাজের উন্নতির কাজে লেগে যায় তবে ভবিষ্যৎটা নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল। তিনি ভেবেছিলেন, সে-সমাজের উন্নতির প্রথমে যা চাই তা আত্মপরিচয়। যে-সমাজ একদিন অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল এবং এবার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে; তাকে প্রথমে নিজের পরিচয় দিতে হবে। সে-কথাটি এমন বড় মনে হয়নি। বস্তুত, সে-সময়ে কথাটি কারোই বড় মনে হয়নি। যাঁরা এ-বিষয় নিয়ে ভেবেছেন তাদের মনে হয়েছে : কেউ ঘুমিয়ে পড়েছিলো বলেই কী সে ভুলে যায় সে কে, কী তাঁর নামধাম? যে-সমস্যার সমাধান তখনকার শিক্ষিত সমাজ সহজভাবেই করেছিলো। কেবল বোঝে নি যে সমগ্র মুসলমান সমাজের আত্মপরিচয়ের নামে যা বলছে তা আসলে সে-সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশ সম্বন্ধেই সত্য। [...]

আমাদের মুসলমান সমাজ বহুদিন একটি ছকবাঁধা জীবনযাপন করে এসেছে, এখনো করে যাচ্ছে। তাতে ব্যতিক্রম ঘটতে শুরু করেছে বলা যেতে পারে। সমাজের এ অবস্থাটি মানুষের আরোগ্যোত্তর অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই সময়ে মানুষের

জীবন নিয়মানুবর্তিতার কড়াকড়িতে বাঁধা পড়ে, বিষয়টা এই যে একটু অসাবধান হলে, চিকিৎসকের কথা অমান্য করলে দু-কদম হাঁটার নির্দেশ ভঙ্গ করে তিন কদম হাঁটলে কী যে হবে বলা যায় না। বলা বাহুল্য, এ-সময়ে জীবন ধারণ করা সম্ভব হয় হয়তো, তবে তেমন জীবন থেকে সফলতা, মৌলিকতা কিছু আশা করা যায় না। সমগ্র জীবনটাই ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভীত মানুষের নিকট থেকে কোনো প্রকার অবদান আশা করা দুরাশা মাত্র।

হবীবুল্লাহ্ বাহারের বিষয়ে দুটি কথা লিখতে বসে ঐ কথাটাই মনে হচ্ছে। তিনি বড় নিদারুণ সময়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন সবেমাত্র একটা সচেতনতা শুরু হয়েছে, নিয়মানুবর্তিতার কড়া বন্ধন ভাঙ্গতে হবে সে-বিষয়ে। কিন্তু দু-কদম হাঁটার নির্দেশ ভেঙ্গে দূরে যেন যাওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগলেও সাহস দেবার লোক বিশেষ নেই। কোথায় কোনদিকে যাবে, কোনদিকে পা বাড়াবে মানুষ? যাবার ইচ্ছা থাকলেও সত্যিই সাহস হয় কী? বংশানুবংশক্রমে এ-কথাই বলা হয়েছে যে বাইরের পথ বিপদসঙ্কুল, অজানা পথ নানাভাবে পতনের সম্ভাবনায় কণ্টকাকীর্ণ। তবু কিছুটা পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছাটা অদম্য হয়ে উঠলেও পা বাড়ানো দায়। এই দ্বন্দ্বের ফলে যা হয়, তার একই রূপ ধারণ করে আত্মপরিচয়ের সন্ধানের বাসনা। আমরা কে তা জানবার ইচ্ছাই প্রবল হয়ে দাঁড়ায়, মনে হয় সামনের পথ দেখার আলো ঐখান থেকেই আসবে। নিকষ কালো পাথরের মধ্যে লুক্কায়িত রোশনি, সে-রোশনিকে উদ্ঘাটিত করা প্রয়োজন। এ-সমস্যা আমাদের ক্ষেত্রে নতুন নয়: এ-সমস্যা অনেক সমাজ আগেকার—এমন একটি সমস্যা সামনে উপস্থিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। আত্মপরিচয় উদ্ঘাটনের চেষ্টায় লোকেরা তাদের নিজেদের ইতিহাস ঘেঁটে এমন জিনিসই উদ্ধার করে যা

একদা তাদের নিজেদের আলোহাওয়াতেই জন্মগ্রহণ করেছিল। আমাদের দু-একজন যাঁরা আত্মপরিচয় উদ্ঘাটনের কার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু নিজেদের জমিতে যা জন্মেছিলো, শাখাপ্রশাখা ফলপুষ্পের সম্ভারে বিকশিত হয়েছিলো, তাকে উপেক্ষা করে দূর দেশে চলে গিয়েছিলেন, দূরদেশের অজানা লোকেদের কীর্তিকৃতিত্ব আপনার বলে মনে করে একটি অসত্য গৌরবলাভের প্রয়াস পান। যেমন মুর নামের পরিচিত লোকেরা সুদূর কর্দভাগ্রানাদাতে কারুশিল্প, স্থাপত্যশিল্পের ব্যাপারে যে-উৎকর্ষতা দেখিয়েছিলেন, একটি শিক্ষাদীক্ষা রুচিতে যে-সভ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন, তাদেরই সে-কৃতিত্বে গৌরবান্বিত হবার চেষ্টা করেন।

আমরা যে-ধর্মে বিশ্বাস করি, সে-ধর্ম যে একটি ভৌগোলিক ক্ষুদ্রতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সে-কথা উপলব্ধি করলে হয়তো ধর্মক্ষেত্রে একরকমের ক্লস্ট্রফোবিয়ার ভীতি থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, ধর্মের সার্বিক চরিত্রের মধ্যে গভীর তৃপ্তিলাভও হয় নিঃসন্দেহে। তবে সমধর্মী কিন্তু দূরদেশবাসী কেউ সুদূর অতীতে যা করেছে তাতে গৌরব করার মধ্যে যে দৈন্যতাই প্রকাশ পায়, তা হাস্যকরও বটে। ফিলিপিনবাসীরা খ্রীস্টান। ইংরেজও খ্রীস্টান। শেক্সপীয়ার নিয়ে ফিলিপিনোরা গর্ব করলে যে তারা তাদের দৈন্যতাই প্রকাশ করবে, নিতান্ত হাস্যকর কাজও করবে। হবীবুল্লাহ্ বাহার যখন সমাজের দিকে তাকান তখন দুটি জিনিস দেখতে পান : একটি হলো যে-পাথর বহুদিন ধরে অটল-খণ্ড হয়ে রয়েছে সে-পাথরে কিছু গতি সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়তঃ সে-পাথরের নড়ার শক্তি সেখান থেকেই আসবে যা সত্যি আমাদের নয়। ধর্মের সর্বজনীন চরিত্রের অন্তর্গত অপরের কৃতি ও অবদানকে আত্মসাৎ করে কিছু সঞ্চয় করার ইচ্ছাই তখন প্রকটভাবে বিকাশ পেয়েছিলো। এটির

একটি প্রাসঙ্গিক ছিলো সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুসলমান সমাজটি তখন সর্বদিক থেকে তমসাচ্ছন্ন শুধু তা নয়, সমাজটি প্রতিবেশী সমাজের এবং বিদেশী শাসকের ঘৃণার বস্তু। মুসলমান সমাজ বুঝেছিল অতীত থেকে সাধারণ মণিমাণিক্য উদ্ধার করে এনে দেখালে চলবে না, দেখাতে হবে হীরা, তা একদিন কোন সমধর্মী বা বিদেশিনী নারীর গলায় ঝুলে থাকলেও সমস্যা নেই। তাছাড়া নিজেদের অতীত সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কোন গবেষণা হয়নি, সম্ভবত সে বিষয়ে কিছু জানাও নেই। গবেষণার আগ্রহ থাকলেও সেদিকে গবেষণার দৃষ্টি দেয়াটা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতোই মনে হয়। গোটা ব্যাপারটা একরকমের চ্যালেঞ্জের মতোই মনে হয়েছে তাদের কাছে। মুসলমান বলেই অধঃপতন হয়েছে, এবং ওই মুসলমান বলেই তারা নিন্দিত হচ্ছে।

চিঠি

প্রিয় হৃষীকেশ বাবু

ভূমিকা : হৃষীকেশ লাহিড়ী

যত দূর মনে পড়ছে সময়টা ছিল ১৯৪১ সালের শেষের দিকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। তখন বাংলা আবশ্যিক বিষয় ছিল বিএ পর্যন্ত। কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ; অধ্যাপক বিনায়ক সান্যাল বাংলা ক্লাস নিচ্ছেন। হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি, শেষ বেঞ্চে একটি প্রিয়দর্শন, ঋজু, দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ যুবক একমনে কী যেন এঁকে চলেছেন। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ। অধ্যাপক সান্যালের দৃষ্টি এড়িয়ে যুবকটির কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। তিনি বেহুঁশ, আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। নিবিষ্ট মনে রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর স্কেচ করছেন। চমৎকার হাত। কাজটা শেষ হলে তাঁর চৈতন্য ফিরে এল। বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা চাইলেন; আমি আবিষ্ট, মুগ্ধ এবং হতবাক। এই সুদর্শন যুবকটিই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। প্রথম পরিচয়েই হৃদ্যতা। আমি ছিলাম হিন্দু হোস্টেলে, ওয়ালীউল্লাহ সাহেব থাকতেন মুসলিম হোস্টেলে—পাঁচ মিনিটের পথ। ওঁর

অনার্স ছিল অর্থনীতিতে, আমার ইংরেজিতে। যাতায়াত শুরু হলো। একদিন কৃষ্ণনগর কলেজসংলগ্ন খেলার মাঠে দুজনে কথাবার্তা হচ্ছিল। আচমকা ওয়ালীউল্লাহ সাহেব বলে উঠলেন, 'আমাদের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হবার আগে আমার যথার্থ পরিচয় আপনার জানবার দরকার। আমি মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী। আশা করি আপনি হয় কংগ্রেসকর্মী, নয় কংগ্রেস সমর্থক। এবার আপনি ঠিক করুন আমাদের আর অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে কিনা।' এ ধরনের অভাবিত সত্যভাষণে আমি অভিভূত। দুজনের মধ্যে যে পর্দা ছিল সেটি অপসারিত হলো। বন্ধুত্ব দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর পথে এগিয়ে চলল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ২৪ খানি চিঠি তার সাক্ষ্য বহন করছে।

১৯৪৯ সাল থেকে আমি সংসারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়লাম; ওয়ালীউল্লাহও বাইরে চলে গেলেন। যোগাযোগ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল। ১৯৫১ সালে আমার প্রথম সন্তান 'হেমন্তী'র মুখেভাতের নিমন্ত্রণের জবাবে উত্তর আসে ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের—সেইটিই শেষ চিঠি। ১৯৭১ সালে আমি যখন বর্ধমানের একটি [...] কলেজে অধ্যাপনা করি সেই সময় হঠাৎ তাঁর মৃত্যুসংবাদে ভেঙে পড়ি। দিনটি ছিল ১৭ অক্টোবর ১৯৭১; *আনন্দবাজার পত্রিকার* শিরোনাম ছিল 'লোকান্তরিত কথাশিল্পী ওয়ালীউল্লাহ'। পূর্ণ পরিণতির বহু আগেই মাত্র ৫০ বছর বয়সেই চলে গেলেন। রেখে গেলেন অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠক-পাঠিকা এবং সাহিত্যসম্ভার। বাংলা স্বাধীন হলো কিন্তু সেই স্বাধীন সোনার বাংলায় তাঁর আর ফেরা হলো না।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের দু-একটি চিঠিতে 'শ্রীণি'র উল্লেখ আছে। কৃষ্ণনগর কলেজে ছিল কো-এডুকেশন।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি আড়াল ছিল। তখন সম্বন্ধটা তুই-তোকারিতে নেমে আসেনি। শ্রদ্ধাও ছিল, মূল্যবোধও ছিল, ব্যতিক্রমও যে না ছিল তা নয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মেলামেশাও হতো এবং সেই সুবাদে না-বলা কিছু বাণীও ছিল, ঔৎসুক্যও ছিল। ৫০ বছর পর 'শ্রীণি'র প্রসঙ্গ আজ অবান্তর। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের মন ছিল সংবেদনশীল, তাঁর অন্তর ছিল কোমল। মেয়েদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল গগনচুম্বী। তবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরোপুরি মানুষ ছিলেন। অতিমানব বলেও নিজেকে দাবি করেননি। আমি তাঁকে একজন বিনয়ী অতি ভদ্র মানুষ বলেই চিনেছিলাম।

চিঠি : ১

হৃষীকেশ বাবু,

আমি উক্ত স্থান হতে প্রত্যাগমন করে অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করচি, তাই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কায করতে পারলাম বলে যদি দয়া করে আমাকে মাপ করেন তো অত্যন্ত বাধিত হবো। আপনার কাছে অনুরোধ করচি, কালকে দিনটা আপনার বাড়ী যাওয়া স্থগিত রাখুন। তাহলে অত্যন্ত খুশী হবো। 'রবি-রশ্মি'টা চাকরটার হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। আদাব। ইতি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
হৃষীকেশ লাহিড়ী
৭ নং হিন্দু হস্টেল

চিঠি : ২

With APOLOGY
S.D.O
Myn. 10/9/42

প্রিয় হৃষী বাবু, (ঋষি বাবু বল্‌বো কী)

আপনার নিকট আমার সহস্রবার ক্ষমা চাইবার আছে। যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এসেচি কবে, এবং আপনার একটা পত্রও পেয়েচি—তবু আপনার কাছে চিঠি লিখি নি, আমার এ বড় অন্যায় হয়েচে। আমি সাধারণতঃ কারো কাছে পত্র লিখিনে, কিন্তু আপনার কাছে লিখবার কথা ময়মনসিংহে আসা অবধি প্রতি মুহূর্তে ভাবচি, এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, তবু এতদিন—এই একটি মাস আপনার কাছে লিখে উঠতে পারিনি। চিঠি যে আগে লিখিনি এমন নয়, তিনটের মত এ পর্যন্ত লেখা হয়েচে, কিন্তু কী করে যেন পোস্ট করা হয়নি। এটাও যে হবে নিশ্চিত করে বলতে পারিনে। যাক সহস্র ক্ষমা প্রার্থনীয়।

কেমন চলচে আপনাদের? আমাদের কলেজটা ছুটির পর ছুটি দিয়েই চলেচে CD movement-এর জন্যে। এটা তৃতীয় সপ্তাহ চলচে ছুটির—এবং আশা করা যায় পুজোর ছুটিও এই করে কেটে যাবে। যদিও বড় কলেজ—এই হিসেবে যে ১৫০০ ছাত্র ছাত্রী আছে এটা অতি বাজে কলেজ—যেমন Staff তেমন Principal। ক্লাসে আমার বসে থাকতে বিরক্তি লাগে—এক একজন যা মূর্তিমান অধ্যাপক—বহর কী তাদের—;কেউ মলমের ক্যানভাসার, কেউ হাটের ম্যাজিসিয়ান, কেউ বা আস্ত গর্দ্দভ।

আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। আমার বড় ভাই এসেছিলেন। তাঁকে আপনার কথা বলেচি, আমার জন্যে পকেটে

করে সরভাজা আনা পর্যন্ত বলেচি। বন্ধুবান্ধবদেরও আমার দুজন পুরান বন্ধু পেয়েচি এই কলেজে—সবাই আমার এখানকার পরিচিতিদের বন্ধুর সম্বল) বলচি। তেমন অন্যায় করেচি কী? আমার পড়াশোনা করতে হবে, ব্যাপারটা ভাবি বটে প্রতিদিন, কিন্তু হয়ে উঠচে না। অবশ্য একটা কারণও আছে। সেটা হচ্ছে যে, বিভিন্ন পত্রিকায় এক সাথে আমাকে ৫/৬টা গল্প পাঠাতে হচ্ছে। এই যে পাঠাচ্চি, আর পরীক্ষার আগে কথাও পাঠাবো না, হাত মুছে ফেলে পড়তে হবে, তাহলে পাস করা হবে না ভাই।

কৃষ্ণনগরের খবর জানতে ইচ্ছে করে। আপনার সঙ্গে কবে দেখা হবে? পরীক্ষার আগে তো নিশ্চয়ই নয়। পুজোর ছুটিতে একবার আমাদের বাসায় বেড়িয়ে যেতে তো পারেন। যদি ইচ্ছে হয়। খুশি হবো তাহলে। পরীক্ষার আগে আব্বা আমাকে কোথাও বেরোতে দেবেন না।

চিত্ত বাবুকে বেশ লাগতো। ভদ্রলোকের কাছে কটা লাইন আমায় লিখবার আছে, ওটাই তার কাছে আমার চিঠি : "If men can find some way to chain to black ans cruel demon which killed Paul Watkins and her brother- yes and Dad also : an evil power which roams the earth,crippling the bodies of men and woman. and...the nations to destruction by visions of unerned wealth, and the opportunity to enslaye and epploit labour."

অবিনাশ বাবুর খবর কী? ছেলেরা আমার সম্বন্ধে কখনো কিছু বলে কী?

আমি দুঃখিত এই জন্যে আমি আপনাকে আমার গল্পগুলি পড়তে দিতে পারিনি। এ মাসের 'মোহাম্মদী'তে প্রাস্থানিক বলে একটা বেরিয়েচে। ইচ্ছে হলে পড়তে পারেন। খুশি হবো। আমি পত্রের

দেরীর জন্য সত্যি অত্যন্ত লজ্জিত, আমাকে ক্ষমা করেন।

ভবদীয়
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় রইলুম। আমি আর পত্রের উত্তর দিতে দেরি করবো না।

চিঠি : ৩

ময়মনসিংহ
১৯/৯/৪২

প্রিয় হৃষী ভাই

ক'দিন আগে আপনার পোস্টকার্ডটি পেয়ে খুশী হয়েছিলাম। তবে আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল জেনে দুঃখিত হয়েছিলাম। আশা করি আপনি সম্পূর্ণ সেরে উঠেচেন, এবং আমার কাছে শীঘ্রই একটা দীর্ঘ চিঠি লিখবার আয়োজন করবেন। সব খবর দেবেন কিন্তু বর্ষামুখর দিনে সাহিত্যের চেয়ে মানুষিক অনুভূতির স্পর্শে গভীর কথোপকথনই বাসে ভালো, নয় কী? সাহিত্য বৈঠকী আলাপ আমার হয় না, ও বিষয়ে আলাপ চলে না বলেই আমার ধারণা। (অবশ্য আপনি যদি অতি সুন্দর একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, কিংবা কোন বিখ্যাত লেখকের কোন চমৎকার কথা পড়ে অথবা বলে জানান, সে আলাদা কথা, কারণ সে-তো সাহিত্যালাপ নয়।) অন্ততঃপক্ষে জ্যোৎস্নারাতে বা গোধূলিবেলায় অথবা বর্ষামুখর দিনে তো সাহিত্যালাপ একেবারে অখাদ্য। নয় কী?

আপনি বলেচেন সামান্য জিনিস পর্যন্ত আমার স্মরণ থাকে,

কথাটা কী বিনয়ে বলেচেন? তা যদি না হয় তবে বলচি যে ওসব সামান্য জিনিসই তো মানুষের চরিত্রের মূর্তিটি অপরের দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে সৃষ্টি করে তোলে। আনন্দভবন দান করাতে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েনি, সেটা চরিত্রের দিকই নয়। মতিলাল যে ছেলের কারাগারের কষ্টটুকু রাত্রিতে মেঝেয় শুয়ে অনুভব করতেন সেটাই তার চরিত্র। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হলে আপনার চরিত্রের কায়াটি স্ফীত নিশ্চয়ই হবে না।

আমাদের কলেজ ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত ছুটি হয়ে গেলো। এসে অবধি শুধু ছুটিই উপভোগ করলাম। আন্দাজ ১৫ দিনের বেশি ক্লাস করিনি। ভালো। আপনার পড়াশোনা কেমন চলচে?

আপনার কাছে আমার প্রীতি ও স্নেহ। ভবদীয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

চিঠি : ৪

Myn, 27.11.42
C/o. Sadar S.D.O

প্রিয় হৃষীকেশ বাবু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলাম। উত্তর দেবার বিলম্ব মার্জ্জনীয়,—আমার এ বিশ্রী স্বভাব আশা করি আপনি ক্ষমার চোখে নিতে পারবেন।

পারিবারিক যে-সমস্যা সম্বন্ধে লিখেচেন, সে, অতি সাধারণ ব্যাপার। এতে আমাদের যদি কিছু না এসে যায় তবেই ভালো।...আমরা চিরমুক্ত।

কৃষ্ণনগরের হাওয়া কেমন ধারা বইচে? এ ছুটিতে আমি কোথাও

যাই নি। পড়াশুনাও কিছু হয় নি। পরীক্ষায় ফেল করতেও পারি।

মিঃ মাসুমের খবর কী?

আমার একটা গল্প (মানুষ শীর্ষক) কার্তিকে সওগাতে বেরিয়েচে। যদি দয়া করে পরে সমালোচনা লেখেন আমার কাছে। তবে আনন্দিত ও বাধিত হবো।

কার্তিকের "মোহাম্মদী"র মূল কপিটাও পড়তে পারেন পরীক্ষার পর আপনার সাথে দেখা হবে-ই? (যে-গোলমাল উপস্থিত হয়েছিলো সে-টা মিটে গেচে কিনা জানাবেন আমাকে।)

আমাদের কলেজ খুলেচে ১৯ তারিখে। আপনাদের টা? চিত্ত বাবু ও অবিনাশের কাছে আমার প্রীতিযুক্ত স্মরণোক্তি। আপনার কাছে প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমার অপরাধের হেতু আপনার চিঠি লেখার বিলম্ব ঘটাবে না আশা করি।

ইতি, ভবদীয়

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

চিঠি : ৫

ময়মনসিংহ

২৯/১২/৪২

প্রিয় হৃষীকেশ লাহিড়ী,

বহুদিন পর আপনার কার্ডটি পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েচি। তবে আপনি কৃষ্ণনগরে যান নি জেনে দুঃখিত হলাম। এবার আপনার পরীক্ষা দেবার পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হলে আমি সত্যি খুব আনন্দিত হবো।

আপনার অন্তরের...ও মাধুর্য্য আমাকে মুগ্ধ করেচে। আপনাকে

আমার চিরকাল মনে থাকবে যদি আপনার মাধুর্য্য অকৃত্রিম হয়। এই পৃথিবীতে আমরা সবাই একাকী আসি, এতে নিঃসঙ্গ যাত্রায় অন্যের মনের নিবিড় যোগাযোগ অমূল্য-সব দিক দিয়ে। জীবনে আপনার উন্নতি হোক, এ কামনা আমি আপনাকে না জানিয়েও করতে পারি। এবং সে-উন্নতি যেন মানুষদের দিয়েই আসে, তাদের দুঃখে ও সুখে।

দেশের তো দুর্দিন সত্যিই কঠিন হয়ে উঠেচে। গাঁয়ে থেকে আপনি আরো ভালো করে উপভোগ করবার সুযোগ পাচ্ছেন। এতেও আমাদের শিখবার আছে।

কৃষ্ণনগরের খবরের জন্য আমার ঔৎসুক্য নেই। তবু জানাবেন।

আশা করি ভালো আছেন। আপনার পড়াশুনা তেমন হচ্ছে না। আমাদের টেস্ট ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে। আপনার চিঠি পেলে আমি খুশী হই। কাজেই নিয়মমত চিঠি লিখবেন। ইতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

কেন মিছিমিছি পত্রিকা দুটো আনাচ্ছেন। সত্যিই সেজন্য আমি দুঃখিত ও লজ্জিত। তেমন ভালো গল্প আমার তো হয় না। পৌষের মোহাম্মদীতে আরেকটি বেরিয়েচে।

চিঠি : ৬

ময়মনসিংহ
১৩/১/৪৩

প্রিয় হৃষীকেশ বাবু,

অনেকদিন আগে আপনার যে চিঠিখানা পেয়েছিলাম তার উত্তর

আমি সাথে সাথেই দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার নিরুত্তর নিস্তব্ধতায় সত্যি আমি দুঃখিত। আশা করি এবার সাথে সাথেই আপনার উত্তর আমার কাছে পৌছবে।

আমার ঔৎসুক্য রয়েচে আপনার খবর জানবার জন্যে এবং এটা নিতান্ত স্বাভাবিক। আপনি এবার পরীক্ষা দিচ্চেন কিনা আমাকে জানাবেন।

কৃষ্ণনগরে আর গিয়েছিলেন নাকী?

আমাদের নামমাত্র টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেচে। আমার পড়াশুনো তেমন কিছুই হচ্ছে না কোনমতে পাশ করবো আর কী! তাই যথেষ্ট।

ঢাকায় তো গোলমাল হয়ে গেলো। এ সম্বন্ধে আমার নিজস্ব মতামত নাইবা জানালাম। কারণ এ ব্যাপারে আমি মোটেও সুস্থমন নই। আশা করি আপনিও নন; বিদগ্ধ ব্যক্তি মাত্রই এটা ভালো চোখে দেখতে পারেন না।

আপনি চিঠি কিন্তু শীঘ্র লিখবেন। আমার শরীর ভালো নেই। পরীক্ষার জন্য মনটাও ভালো নয়; এবার পড়তে energy পাচ্ছি না তেমন। আমার প্রীতি ও ভালোবাসা জানবেন। ইতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

চিঠি : ৭

6.3.43

প্রিয় হৃষীকেশ বাবু,

কয়েকদিন আগে আপনার কার্ডখানা পেয়ে খুশী হয়েছিলাম। তাছাড়া বেশী খুশী হয়েচি আপনি আমদের সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছেন

এ-ই সংবাদে। আশা করি অনার্সে আপনি ভালো করবেন। কেমন পড়াশুনা করচেন? (বাংলায় আপনার তো অনার্স রয়েচে, না?)

আমার কিন্তু কিছুই হচ্চে না। তার ওপর চোখ খারাপ হওয়ার নানা গোলমালে এতদিন কিছু-ই হয়নি, হচ্চেও না। এ চিঠিখানা লিখতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্চে সামান্য।

মানুষ আপনার ভালো লেগেচে জেনে খুশী হলাম। ওটার ভাবার্থ লিখতে গেলে বেশ বিশদভাবে বলতে হয়, তা-ই সেটা আপাতত মুলতুবি থাক, দেখা হলে হবে। (না হয়, পরীক্ষার পর একটা দীর্ঘ চিঠিতে)।

আপনি অনেক সময় আমাকে অনর্থক প্রশংসা করেন। অন্তরঙ্গতার মধ্যে এর কোনো প্রয়োজন নেই; বরঞ্চ খারাপ দেখায় ও শোনায়।

আপনি পরীক্ষা দিয়ে ময়মনসিংহ-এ আসবেন জেনে আনন্দিত হলাম। চিত্ত বাবুর কোনো চিঠিপত্র আসে কী? আশা করি তিনি ভালো আছেন। মিস নিবেদিতা ও মিস নীলিমা মানুষটা পড়েচেন, লিখেচেন, ওঁদের সে-টা কেমন লেগেচে তাতো জানান নি। বাশদিয়া থেকে কবে কৃষ্ণনগর রওনা হবেন? পরীক্ষার ঠিক আগে-ভাগে? আশা করি ভালো আছেন। আমি ভালো। আমার প্রীতি জানবেন। ইতি

ভবদীয়
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
৬.৩.৪৩
ময়মনসিংহ

চিঠি : ৮

ময়মনসিংহ
৩০.৩.৪৩

প্রিয় হৃষীকেশ বাবু,

আপনার কার্ডখানা গতকাল বিকেলে যথাসময়ে পেয়েচি। শীঘ্র উত্তর দেবার কথা না বললেও আমি শীঘ্র উত্তর দিতাম। (৩১/৩ : এটা একদিন পর posted হচ্ছে।)

আপনার অন্তর কোমল সে-কথা আমি জানি। তাই দেশের এ শোচনীয় অবস্থা (বিশেষ করে নিজের চোখে প্রতি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করচেন বলে) আপনার অন্তরে লাগচে। জেনে খুব খুশি হলাম। আপনার দুঃখ গভীরতম হোক, প্রার্থনা করি, আবার সে দুঃখ থেকে আমাদের দেশের মঙ্গল আসবে।

শুধু ওরা কেন, স্টেটের ব্যাপারে কোন মানুষ (অতিমানুষ ছাড়া) diplomacy বা উচ্চাঙ্গের কথা বোঝে না। যেখানে 'হা অন্ন হা অন্ন' সেখানে অচিরে তলোয়ার ঝলসে ওঠে। এখানে বিবেক নেই : পশুশক্তির প্রাবল্যই প্রধান শতকরায় শতক হিসেবে। দেশের শোচনীয় অবস্থার এ নিশ্চয় প্রথম ধাপ, আরো দেখবেন। তবে নিষ্কর্মার মত নিদারুণ বিচলিত হবেন না অনুরোধ করি বন্ধু হিসেবে। এখন আবার বসন্ত কিসের? পলাশফুলের রাঙা রঙে মানুষের রক্ত, কচি নোতুন পাতায় অসহায়ের সরলতা। সভ্য মানুষ এদেরকে হত্যা করচে : তার প্রতিশোধ একদিন আসবে। সেদিন আমরা যেন জয়ের উল্লাসে মন হারিয়ে না ফেলি।

পরীক্ষার পর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। পরীক্ষা দিয়েই হয়তো কলকাতায় যেতে হবে। সেথায় দেখা হবে আপনার সাথে।

আমার অন্তরের গভীর স্নেহ চিঠির এতগুলো অক্ষর ছাপিয়ে

আপনার অন্তরে পৌঁছে যেন। ইতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

পুনশ্চ : পরীক্ষা দিয়ে ময়মনসিংহ থেকে বেরুতে যদি দেরী দেখি তবে আপনাকে এখানে আসতে অনুরোধ করবো

চিঠি : ৯

25/4/1943

প্রীতিনিলয়েষু,

আপনার তিনটি চিঠিই যথাসময়ে পেয়েচি। আমার এসব নিরুত্তর ব্যবহারের জন্যে সত্যি আমি লজ্জিত। আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন।

আসল ব্যাপারটা হয়েচে কী, ঈদ আসচে পূজা আসচে, তাছাড়া কয়েকটা পত্রিকার প্রয়োজন, তাই গত বিশ কী পঁচিশ দিন হতে আমাকে অবিশ্রান্ত লিখতে হয়েচে। আমার কাযের অবসান ঘটেচে গত পরশু হতে এবং ভাবছিলাম আপনার কাছে চিঠি লিখবার কথা, কিন্তু তা না করে একটা ছবি এঁকে ফেললাম। ৪ ফুট ৪ ইঞ্চি ছবি, অথচ সেটা করতে ৯টি ঘণ্টা লেগেচে। ভারী সুন্দর হয়েচে সেটি, আপনাকে দেখাতে ইচ্ছে করচে। (অথচ সেটা ইতিমধ্যে ফ্রেমে ঢুকে পড়েচে।) {এবং দেয়ালে ঝুলচে।}

আমাদের রেজাল্ট সম্বন্ধে আমি বড় বোকামী করেচি। আমার বড় ভাই আজ গত তিন সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত লিখেছেন আমার রোল আর নাম্বার পাঠাতে, আমি কামের ঠেলায় পাঠাতে পারি নি। আমার ধারণা ছিলো আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে বেরুবে, তাই নাম্বার পাঠাই-পাঠাই করছিলাম, এমনসময় রোববারের কাগজে

ব্যাপারটা দেখে তো অবাক। যাক। আজকালের মধ্যে এখানে আসচে। কিন্তু না এলেই ভালো। ছাত্রদের মধ্যে একটা গুজব উঠেচে যে আমি distinction পেয়েচি। কাযেই ফল না এলেই ভালো, কারণ Dist. যে পাবো না সে সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত...।

আমাদের ভর্তি হতে হবে দেখ্‌চি আগামী মাসের ৮ তাং এর মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সারকুলার বল্‌চে। কাযেই আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই কলকাতা রওনা হতে হবে দেখ্‌চি। আপনি কবে হচ্ছেন জানাবেন। (by the return of post).

Carron Tea Estate থেকে লেখা আপনার চিঠিটা আমার বড় ভালো লেগেচে। চিঠি দুটির উত্তর দিইনি বলে আবার লজ্জা প্রকাশ করচি। কার অবস্থা কেমন? জানাবেন।

আর সব খবর দেবেন।

আশা করি ভালো আছেন। ইতি ময়মনসিংহ ৭ই ভাদ্র, '৫০

প্রীতিমুগ্ধ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

পুনশ্চ: ২৫/৪/৪৩। চিঠিটা পোস্ট করতে একদিন দেরী হয়ে গেলো। আমার পরীক্ষার ফল পেয়েচি। পাশ করেচি ডিস্টিংকশন নিয়ে। আশা করি খুশী হবেন। আপনার খবরের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে রইলাম। by the return of post জানাবেন। ইতি

সৈ. ও.

শ্রী হৃষীকেশ লাহিড়ী

(রামদিয়া)

চিঠি : ১০

ময়মনসিংহ

প্রিয় হৃষীকেশ বাবু,

আশা করি আপনি আমার ৭ তাং লেখা চিঠিখানা ইতিমধ্যে পেয়েচেন। আমার ৯ তাং ও ঢাকায় যাওয়া হয়নি, বুঝতেই পারচেন। কারণ, আমাদের বাসাটা একেবারে হাসপাতালে পরিণত হয়েচে। মা ছাড়া বোনদেরও জ্বর হয়েচে। ঢাকা থেকে ভাই এসেচেন তাঁরও influenza হয়েচে। একমাত্র আমি ও আব্বা ভালো আছি।

কখন যে বেরুতে পারবো একমাত্র আল্লা জানেন। আর কোন প্রোগ্রাম করবো না। (তবে মনে মনে এখনো আশা রাখি ১৬/১৭ তাং এর মধ্যে হয়তো মুক্তি পাবো।) ঢাকার ঠিকানায় লিখেচেন কী চিঠি? লিখলে ওরা Tedirect করে দেবেন।

আশা করি ভালো আছেন। স্নেহ ও শ্রদ্ধা। ইতি ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, '৫০ ময়মনসিংহ।

ভবদীয়
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

চিঠি : ১১

বাবু হৃষীকেশ লাহিড়ী, বন্ধুবরেষু :

ঢাকায় আপনার কার্ডখানা সময়মত পেয়েছিলাম। ঢাকা থেকে ফিরেচি গত ২৮ তাং। আমার আব্বা বাঁকুড়া বদলি হয়েচেন। শীঘ্র আমাদের সেখানে রওনা হতে হবে। ঢাকা হয়ে যাবো, কাযেই সেই গোয়ালন্দ। আপনাকে জানাবো। আমাদের হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যে রওনা হতে হবে। এর মধ্যে একবার আপনার

চিঠি আশা করি।

শ্রীনির সম্বন্ধে অযথা ঔৎসুক্য বোধ করচি, সেই জন্য যথেষ্ট লজ্জিত। তবে জানতে আশা করি।

আজ ইতি।

ভবদীয়
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

চিঠি : ১২

ময়মনসিংহ
৩২ আষাঢ় '৫০

প্রিয় হৃষীকেশ বাবু,

আশা করি ২রা জুলাই তাং এ লেখা চিঠিখানা সময়মত পেয়েছিলেন। উত্তর না পেয়ে চিন্তিত আছি। আশা করি সুস্থ আছেন।

আমার আব্বার বদলী আপাতত স্থগিত আছে, তবে এখনো কোন চূড়ান্ত সংবাদ পাওয়া যায় নি। এবং না পাওয়া পর্যন্ত আমি কোথাও যেতে পারচি না। পরীক্ষা দিয়ে অবধি শান্তি নেই।

শুধু লিখচি আর পড়চি। তা-ও ভয়ানকভাবে একঘেঁয়ে। একটা লোক নেই সন্ধেয় একটু আলাপ করবো। যারা দুয়েকজন ছিল তারা ইতিমধ্যে অন্য কোথায় সরে পড়েচে। ছুটিতে কে আর থাকে।

এও নেহাত মন্দ নয়। একটা নিশ্চিদ্র নিঃসঙ্গতা।

দেশের অবস্থা জানাবেন। আগামীকাল আমি আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম দেখতে যাচ্ছি। আমার অভিজ্ঞতা পরে আপনাকে জানাব। ইতি

ভবদীয়
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

চিঠি : ১৩

ময়মনসিংহ
২৫.১০.৪৩

প্রিয় হৃষীকেশ বাবু,

সময়মত আপনার চিঠি পেয়েছিলাম। ম্যালেরিয়ায় ভুগেছেন জেনে দুঃখিত হলাম, আশা করি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন।

বর্তমানে কলকাতায় আমি হস্টেলে আছি। Carmichael Hostel: 51 Baithakkhana Road. হস্টেলটি রিপন কলেজের কাছে। আশা করি চেনেন। আমি থাকি ১৬ নম্বর ঘরে : তেতলায়। আমি ৬ই নভেম্বর কলকাতা রওনা হব। আশা করি এরপর আপনার সাথে সেখানে দেখা হবে। কলকাতায় এলে অনুগ্রহ করে এখুনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। আসবার আগে আমাকে চিঠি লিখে জানাবেন।

সাহিত্য নিলাম না। সাহিত্য আমার, আর যা নিলাম তাকে আমার করতে চাই। বহুবিবাহ হচ্ছে আর কী।

আশা করি ভালো আছেন। এখানে লিখলে এমনভাবে লিখতে হবে যাতে আমি 'on or before' পাঁচই নভেম্বর সেটি পাই। প্রীতি ও স্নেহ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

চিঠি : ১৪

১ বালুহাক্কাক লেন,
পার্ক সার্কাস, কলকাতা,
৫.১.৪৪

প্রিয়বরেষু

অকস্মাৎ-প্রাপ্ত আপনার পত্রখানা আমাকে আকস্মিক আনন্দ

(এবং আকস্মিক আনন্দ প্রাবল্যে উচ্ছ্বসিত বলে অতি উপভোগ্য হয়ে থাকে) দিয়েছে। তবে শুধু একাকীত্বেই আমার প্রয়োজন আপনার কাছে দুর্নিবার জেনে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছি।

গত পুজোর ছুটির আগে কথামত আপনার কাছে আমি চিঠি লিখছিলাম, কিন্তু আপনার কোন উত্তর না পেয়ে গোয়ালন্দ আর যাই নি। ভাবলাম, আপনি হয়তো নেই, নইলে অন্ততঃ দুটি লাইন লেখা চিঠি পেতাম আপনার কাছ থেকে।

চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন জেনে দুঃখিত ও সুখী দুটিই হয়েছি, এই যদি জানি যে অদূর ভবিষ্যতে আপনার ভালো চাকরি প্রাপ্তির সু-সম্ভাবনা রয়েছে।

মিঃ ইউ এল গোস্বামী (বর্মা সিভিল সার্বিস) কী আপনার কাকা? আমার আব্বা বর্ধমানে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা হাকিম হিসেবে, মিঃ গোস্বামী তাঁকে তাড়িয়ে (ময়মনসিংহ তাড়িয়ে) বর্ধমানে গেছেন।

শীঘ্র কলকাতায় আসুন। যথেষ্ট আলাপ করা যাবে। অবশ্য আপাতত পরীক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত। (লক্ষণীয় : পড়া নয়, চিন্তায় ব্যস্ত।)

পূর্বাশা (সঞ্জয় ভট্টাচার্যের) পাবলিশিং হাউস আমার একটা বই করছেন।

স্নেহ ও প্রীতি। ইতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

চিঠি : ১৫

কলিকাতা
৮/২/৪৪

প্রিয় বন্ধু হৃষীকেশ,

আপনার আগের কার্ডখানাও পেয়েছিলাম। সেদিন চিঠিটাও

পেলাম। আমার উত্তর না দেয়া বড় অন্যায় হয়েছে এবং সে অন্যায় আপনার কাছে আমি করতে পারি।

আজ আমার শরীরটা অসুস্থ, আর দিনটা মেঘলা, অনেক কারণে মনটাও খারাপ। তাই ভাবলাম আপনার কাছে চিঠি লিখি।

বলবার তেমন কিছু নেই, আবার বলবার অনেক কিছুই আছে, এবং সে অনেককিছু কাগজের সীমাহীনতার দুর্বলতা জেনে হয়তো মুখ খুলতে পারছে না। কাজেই অন্য কথাও চুপ। মাঝে মাঝে অনুভব করি এই কথাহীনতার মত নীরব আনন্দ আর কিছুতে নেই। মনে হয় tower of silence-এ যেন বসে আছি সব চুপ—সব চুপ।

হস্টেলে এখন নীরবতা। একটা কাক ডাকছে কাছে—নীরবতার প্রতীক। কলম চল্‌ছে না আমার, ঘুম এলে যেন অঙ্গ অবশ হয়ে আসে তেমনি আমার মনে ঘুম আসছে বলে তার সঙ্গে ভাষা জড়িয়ে আসছে। কাজেই ইতি।

প্রীতিমুগ্ধ
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

পুনশ্চ : শিগগির কী একবার আসবেন কলকাতায়?

চিঠি : ১৬

এইচ. লাহিড়ী
১৩২ হাজরা রোড
কলকাতা

১, বালু হাক্কাক লেন
পার্ক সার্কাস
কলকাতা : ১২.৭.৪৫

প্রিয় লাহিড়ী,

জেনে দুঃখ পাবেন যে গত ১৮ জুন এখানে আমাদের

কলকাতার বাসভবনে আমার প্রিয় পিতাকে আমি হারিয়েছি। এই অত্যন্ত দুঃখের সংবাদটি আপনাকে আরো আগে জানাতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত।

দুটি গল্প সল্প করার জন্য আপনি কি অনুগ্রহ করে একদিন সন্ধ্যায়, ধরুন ১৪ তারিখে, আমার এখানে আসবেন?

আশা করি কুশলেই আছেন।

ভবদীয়
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

চিঠি : ১৭

রেডিও পাকিস্তান
ঢাকা
২০.৯.৪৮

প্রিয় হৃষীকেশ লাহিড়ী,

১২ সেপ্টেম্বরের চিঠিটার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। দুর্ভাগ্যক্রমে চিঠিটি আমার হাতে পৌছল মাত্র গতকাল।

কায়েদে আজমের মৃত্যু অপূরণীয়। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এযাবৎ পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তিত্বদের একজন। কিন্তু তার মহত্ত্ব ছিল প্রধানত এই যে তিনি অধঃপতিত, প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া মুসলমানদের অনিশ্চিত অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে তার স্বধর্মের কোটি কোটি মানুষের স্বার্থের পক্ষে যে বিশেষ অবদান রেখেছেন, সেখানে তার বড়ো মহত্ত্ব। গত দশ বছর যে তার জীবনের সবচেয়ে কীর্তিময় সময় ছিল এটা আপনিও নিশ্চয়ই মানবেন; এই সময়কালে তার সকল শক্তি ও মনোযোগ

নিবন্ধ ছিল শুধু একটা লক্ষ্যের প্রতি : মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করা। এর জন্য তিনি কঠিন পরিশ্রম করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। তিনি যা কিছু করেছেন সে জন্য মুসলমানরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই বিদেহী নেতার মহত্ত্ব সম্পর্কে আপনার ইতিবাচক মূল্যায়ন তার বিশ্বাসের অনুসারীদের জন্য বিরাট আনন্দের ব্যাপার। আমার বিশ্বাস, এই খাঁটি উপলব্ধির সঙ্গে মিশে আছে আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। আমি আপনার সঙ্গলাভে সর্বদাই সবচেয়ে আনন্দবোধ করি; আপনার মানবিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও সবসময় আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

আমরা, এই উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানরা যদি জাতীয় পর্যায়ে এই উপলব্ধি অর্জনের জন্য আন্তরিকভাবে নিজেদের নিবেদিত করতাম এবং তা অর্জন করতে সক্ষম হতাম, কি সুখী আর গর্বিতই না হতে পারতাম আমরা। পাকিস্তান ও ভারত উভয়ই আজ করুণভাবে খাটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই স্থায়ী বিচ্ছেদের ভবিষ্যৎ দুঃখজনক, কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবন রক্ষার জন্য এই অস্ত্রোপচার অনিবার্য ছিল। যদি আমরা শুধু এই অস্ত্রোপচারের জরুরি দরকারটাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারতাম!

আমরা, দুই ভগিনীতুল্য জাতি, নিজ নিজ পিতাকে হারিয়ে আজ এতিম। আমাদের অবশ্যই সুখে দুঃখে বন্ধু হিসেবে থাকা এবং সেটা চালিয়ে যাবার শপথ নিতে হবে। আমাদের মাঝখানে বাধাবিপত্তিগুলি দূর করতে হবে, কেননা এসব বাধাবিপত্তি নিঃসন্দেহে অলংঘনীয় হয়ে উঠতে চাইবে এবং আমাদের অজ্ঞতা ঘৃণা আর ভুল বোঝাবুঝির দেওয়ালের মধ্যে আমাদের বন্দী করে ফেলবে।

আমি জেনে পুলকিত হয়েছি যে আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী; আমিও। সামনের পূজায় আপনি এখানে এলে খুব খুশি হবো। যদিও আমি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। এখানে আপনার আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করতে পারবো কিনা কিন্তু একটা উষ্ণ হৃদয় আপনাকে স্বাগত জানাবে।

আদাব।

ইতি
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

চিঠি : ১৮

৩ পুরানা পল্টন
রমনা, ঢাকা
৩১/৫/৪৪

প্রিয় হৃষীকেশ লাহিড়ী,

বিবাহের মাধ্যমে এক নবজীবন লাভ করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করছি আপনার বধূ আপনার চেয়েও বেশি স্নেহপরায়ণ ও কোমলহৃদয় হবেন, এবং অনিন্দ্য সুন্দরী হবেন।

আমাকেও কি বিয়ে করতে হবে? যতদূর মনে হয় বিয়ে ভাবনাটা আমার কাছে দারুণ লাগে। আপনার পরামর্শ কী?

আপনার অত্যন্ত সুখী, মধুর ও দীর্ঘ বৈবাহিক জীবন কামনা করি।

ভবদীয়
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

হৃষীকেশ লাহিড়ী
৪৮, কৈলাস রোড, হাওড়া

চিঠি : ১৯

করাচি
৭ মার্চ...

প্রিয় বন্ধু,

আপনার সদয় পত্রটির জন্য অনেক ধন্যবাদ, পত্রটি আমাকে শুধু চমৎকৃতই করেনি, সেই সঙ্গে মানুষের মৌলিক ভালোত্বের প্রতি আশ্বস্ত হবার একটা নির্দিষ্ট কারণও হয়েছে। বিশাল বিশাল যে আবর্ত আর কুণ্ডলীর মধ্যে পৃথিবীতে বাস করছি সেখানে ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আটকা পড়ে আছি। আমরা খড়কুটোর মতো। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আশাবাদী হতে পারি না। যে বিশাল ব্যাপক রূপান্তর ঘটছে তারই মধ্যে একটা সমগ্র জীবন উৎসর্গিত হয়ে যাবে এটাই স্পষ্ট। অবশ্যই এটা একটা বেদনাদায়ক প্রক্রিয়া, আর আমরা সমগ্রের অংশ হিসেবে তা ভোগ করতে বাধ্য।

একদিন আমি মহেঞ্জোদারো বেড়াতে গিয়েছিলাম, মহেঞ্জোদারো, নাম না জানা সেই প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ। বিশাল স্নানাগার থেকে বর্তমানে বিলুপ্ত উপাসনালয়গামী পথটির ওপর যখন দাঁড়িয়েছিলাম, তখন হঠাৎ আমার এমন এক ভাবগম্ভীর সমবেত উপাসনার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভূত হলো যে উপাসনায় প্রত্যেকের আত্মার গ্লানি কদর্যতা ও ঘৃণা পরিষ্কার করবার জন্য অংশগ্রহণ করা উচিত। এই প্রাচীন নগরীর ওপর একাধিকবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর বিপর্যয় নেমে এসেছিল। আমি দেখতে পাচ্ছি, এরকম সবুজ দিনগুলোতে ভাবগম্ভীর মানুষের মিছিল পরিত্রাণের আকাংখায় নীরবে এগিয়ে চলেছে উপাসনালয়টির দিকে। সেইসব দিনে সিন্ধুনদ ছিল বিশাল আর বিপদসঙ্কুল; একাধিকবার তা সেই নগরীকে ভাসিয়ে নিয়েছে, বিপন্ন করেছে,

যার ফলে সেখানকার অধিবাসী শেষ পর্যন্ত চিরতরে পালিয়ে গিয়েছে। আমাদের যুগও একই রকম সমস্যাসঙ্কুল, বারবার আমাদের তা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা আমাদের বাসভূমি ছেড়ে যাবো না, আমাদের বাসভূমিকে আমরা 'মৃতের স্তূপ' বা মহেঞ্জোদারো হতে দেব না।

এখন আমি করাচিতে। আট মাস হয়ে গেল এখানে আছি এবং সম্ভবত স্থায়ীভাবে এখানেই থেকে যেতে হবে। একটা পদোন্নতি হয়েছে আমার এবং বেশ মোটা মাইনে পাচ্ছি এখন, আমার নিজস্ব যোগ্যতার বিবেচনায়। আপনার খবরাদি কী? আমি নিশ্চিত, আমার ভগিনী আপনাকে বেশ সুখী করেছেন। আমি অবশ্যই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী।

ভবদীয়
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

ঠিকানা :
বার্তা সম্পাদক
সেন্ট্রাল নিউজ অরগানাইজেশন
রেডিও পাকিস্তান, বন্দর রোড, করাচি

চিঠি : ২০

করাচি
২০/১/৫১

প্রিয় হৃষীকেশ লাহিড়ী,

জেনে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি যে আপনি আপনার নিজের গ্রামে একটি অপূর্ব সপ্তাহ কাটিয়ে এসেছেন। কখনো, কখনো ভুলে

যাবেন না সেটা আপনার গ্রাম এবং আপনি তার। মানুষ আপনাকে ভালোবাসে কারণ আপনি তাদের একজন আর যে মাটিতে আপনার শিকড় তাদের শিকড়ও সে মাটিতেই।

আমি সম্ভবত দু তিন মাসের মধ্যে কলকাতায় পাকিস্তান হাইকমিশনে প্রেস এ্যাটাশে হিসেবে যোগ দেব। তারা অবশ্য আমাকে অন্য কোনোখানে পাঠাতে চান; আমি কলকাতা যেতে চাই।

ভবদীয়

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

https://www.facebook.com/nirjanprantor